সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

১ম পর্ব

১৯৭১

রাজারবাগ, ঢাকা।

১৯৪৮ সালে আমার ছোট চাচা ঢাকার রাজারবাগে ১০ বিঘা জমি কিনেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ঠিক পুর্ব দিকে ছিল এই জমিটি। পরে আব্বা, বড় চাচা, এক দুর সম্পর্কের ভাই এবং এক অনাত্নীয় জনাব পাটওয়ারি সাহেব এই চার জন মিলে এই দশ বিঘা জমির কিছু অংশ ক্রয় করে ভাগাভাগি করেন। আমার আব্বা ১০০০ টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন নয় কাঠার মত অংশ। এই দশ বিঘার মধ্যে তিনটি পুকুর ছিল। আমার আব্বার জমিটা ছিল একদম পুর্ব প্রান্তে, এক পুকুর ধারে, পুকুরটাও ছোট চাচার ছিল এবং এক বিঘা পরিমান জায়গা জুড়ে। এ পুকুরের পরও আরো কয়েকটা পুকুর ছিল, মানে দেখতে একটা বিলের মত লাগত। এ বিলটা গিয়ে একটা খালে পড়ে এবং পরিশেষে মিশেছে শীতলক্ষ্যা নদীতে। বাসার সামনে বিরাট মাঠ, পাশে বিশাল বিল, বর্ষাকালে খুব সুন্দর লাগত। আমাদের একটা ছোট নৌকাও ছিল, মাঝে মাঝে এই নৌকা করে ঐ বিলে ঘুরতাম। আমি সাঁতারও শিখেছি এই পুকুরেই।

আমার জন্ম ১৯৫২ সালে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গোপালপুর উপজেলার হেমনগর রাজ বাড়িতে। আব্বা তখন সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে রাজা হেমচন্দ্র রায়ের বিশাল এস্টেট দেখাশোনা করতেন। এখন হেমনগর টাংগাইল জেলার অন্তর্গত। আমার পাঁচ ভাই ও দু বোনের মধ্যে আমি সবার ছোট। আমার তিন মাস বয়সে আমার পরিবার ঢাকায় চলে আসে এবং রাজারবাগে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আমার স্কুল, কলেজ, মেডিকেল, চাকুরী জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধ সব এই রাজারবাগ থেকেই। তবে চাকুরী জীবনের কিছু সময় বাইরে কাটিয়েছি। আমার এই লেখাটি ১৯৭১ এর উপর, মুলত রাজারবাগকে নিয়ে সাথে ঢাকা এবং আসেপাশের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৭১ সালে রাজারবাগে আম্মা, আমি এবং আমার দু ভাই, এক ভাবী এবং দুজন ভাতিজা, এ ছিল আমাদের রাজারবাগের পরিবার। এছাড়া আমার সবার বড় ভাই তার পরিবার সহ তখন পাকিস্তান নেভীতে ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের অফিসার এবং পোস্টিং ছিল করাচীতে, আর দু বোনও তাদের পরিবার নিয়ে পাকিস্তান থাকতেন। বড় দুলাভাই ইসলামাবাদে প্ল্যানিং কমিশনের চীফ ইকোনমিস্ট, ছোট দুলাভাই করাচী ইউনিভারসিটিতে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে চাকুরি করছিলেন। আমার মেজ ভাই পিআইএ তে বোয়িং ক্যাপ্টেন, জানুয়ারি মাসে উনি ঢাকায় আসেন পোস্টিং নিয়ে। আর সেজো ভাই বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে পিএইচডি করছিলেন। আমার চতুর্থ ভাই তখন বিআইডিএস এ রিসার্চ ইকোনমিস্ট হিসাবে ঢাকায় কর্মরত। আমি মেডিক্যালের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আম্মা বিধবা গৃহবধু। আব্বা মারা গেছেন ১৯৫৮ সালে। রাজারবাগে অন্যান্যদের মধ্যে পাশে দু চাচা, চাচাত ভাই বোনরা এবং অন্য দুই পরিবার থাকতেন। ৭১ সালে রাজারবাগে আমরা এই পাঁচ পরিবারে সব মিলিয়ে

উর্ধে ১০০ জনের মত ছিলাম, আজ ২০১৮ সে একই জায়গায় প্রায় ২০০০ জনের মত লোকের বসবাস। আমরা ছাড়া আরো তিন চারটা পরিবার ছিল যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। ওখানে এক বাসায় ভাড়া থাকতেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। ওনার বাসায় প্রায়ই যাওয়া আসা হতো। উনার নির্দেশনায় ৭০এ একুশে ফেব্রুয়ারীতে নগ্ন পদে শহীদ মিনারে গিয়েছিলাম গান গান গাইতে গাইতে।

১৯৭০ সালে লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে পাকিস্তানের নির্বাচন হয় ডিসেম্বরের ৭ তারখে। অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল এই নির্বাচন। আনন্দম মুখর পরিবেশে শেষ হয় ভোট গ্রহন। কোথাও মারামারি, গন্ডগোল ভোট কাড়াকাড়ি, ব্যালট বক্স ছিনতাই, এসব কিছু নেই, কি উৎসব মুখর পরিবেশ। সারাদিন লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জনগনের ভোট দেয়া দেখলাম, জীবনে এই প্রথম নির্বাচন দেখলাম। সন্ধ্যা থেকে ভোট গননার ফলাফল ঘোষনা করা হয়। আমরা সারা রাত জেগে নির্বাচনের ফল সরাসরি দেখেছিলাম। রাজারবাগের পাশের পাড়া মোমেনবাগে ছিল নির্বাচন অফিস। সেখানে বাইরে বড় পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছিল নির্বাচন ফলাফল। আমরা পাড়ার বন্ধুরা কি আনন্দ নিয়েই না উপভোগ করছিলাম সে উৎসব। একটু পর পর শুনছিলাম বিভিন্ন কেন্দ্রের ফলাফল, আর তার সবগুলতেই আওয়ামীলীগ প্রার্থী জয়ী হচ্ছে। কি আনন্দ উল্লাস আর হৈচৈ, মনে হচ্ছিল ঈদ। ৭০ এর সেই নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬০ টি আসন পেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়। অন্যদিকে ভুট্টর পিওপিলস পার্টি পায় ৮১ টি আসন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে দল ১৫১ টি আসন পাবে সে দল সরকার গঠন করবে। সুতরাং আঃলীগ সরকার গঠন করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সারা দেশ উল্লাস আর আনন্দে ফেটে পরে। কিছুদিনের মধ্যে এই প্রথম বারের মত একজন বাংগালি প্রধান মন্ত্রী হবেন। মানে শেখ মুজিব হবেন পাকিস্তানের নতুন প্রধান মন্ত্রী। প্রায় ১২ বছর পর সামরিক আইনের সমাপ্তি ঘটছে। নির্বাচন, ভোট, গণতন্ত্র এসব বইয়ে পড়েছি, কিন্তু দেখিনি, এই প্রথম দেখার সৌভাগ্য হলো। এখন জাতীয় সংসদ অধিবেষন বসবে ঢাকায় এবং মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট দিন তারিখ ঘোষনা দিবেন এবং সেদিন ঢাকায় জাতীয় সংসদ বসবে, সেদিনই প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রী সভা গঠিত হবে। সারা দেশবাসী আনন্দিত, উল্লাসিত। এখন শুধু অপেক্ষা ইয়াহিয়া খানের একটি তারিখ ঘোষনা। খুবই নিয়মতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া। পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ এবং দু একটা দল ছাড়া বাকি সব রাজনৈতিক দলগুলা শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুল থেকেও অভিনন্দন বার্তা আসছে। অনেক নেতারা সশরীরে এসে দেখা করছেন। দেশে এক আনন্দের জোয়ার বয়ে চলছে। এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির লগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা শুধু প্রেসিডেন্টের ঘোষনা। খবর এল ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিবেন। আমরা উত্তেজিত, বুকফাটা আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছি সে ভাষনের।

এল ১লা মার্চ, ১৯৭১, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আজ জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষন দিবেন। রেডিও ও টিভিতে তা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। ভাষন শুরু হলো। আমরা অপেক্ষা করছি তারিখটা শোনার জন্য। সারা দেশবাসী গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে ঐ ভাষন। কিন্তু না, সবার আশা আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে এবং সবাইকে অবাক ও হতাস করে উনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনিদৃষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করেন। এই ভাষন শেষ হবার আগেই রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। মানুষ ক্রোধে ফেটে পরে, দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সব বন্ধ হয়ে যায়। দেশের সর্বত্র ছাত্র ও জনতা মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ আর শ্লোগানে ওই ঘোষনাকে প্রত্যাখ্যান করে,

ধিক্কার জানায়। ইয়াহিয়ার কুশপুত্তলিকা পোঁড়ান হয়। আইন শৃঙ্খলা পরস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। ওইদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড। ইয়াহিয়ার ভাষনের পরপরই তা পন্ড হয়ে যায়। সরকারী অফিসগুলা থেকে ইয়াহিয়া খান এবং মোহাম্মদ আলীর ছবি নামিয়ে ভেংগে ফেলা হয়। পাকিস্তানী দোকান এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গুলি আক্রমনের শিকার হয়। অনেকটা রায়টের আকার ধারন করে। দেশে তখনো মার্শাল-ল বলবৎ। কিন্তু ছাত্র জনতা আর মানছেনা। লক্ষ্য লক্ষ্য লোক ঢাকার রাজপথ দখল করে আছে। ডাকসুর ভিপি জনাব তোফায়েল আহমদকে আহবায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। অন্যান্য শহরেও একই চিত্র। সর্বত্র ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়, কিছু করছেনা বা বলছেনা। অবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় পাক আর্মি ১৪৪ ধারা আবার কোথাও কারফিউ দেয়, কিন্তু কোনটাই কাজে আসেনি। সহিংসতা থামাতে বিভিন্ন স্থানে লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, আবার কোথাও গোলাগুলি করে। বিভিন্ন রাস্তায় পাকিস্তান আর্মি টহল দিতে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলাতে চেক পোস্ট বসান হয়। কিন্তু তাতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এর মাঝে ৩রা মার্চ মৌচাকের সামনের রাস্তায় ছাত্র জনতার এক বিশাল মিছিলে পাকিস্তান আর্মি গুলি করে এবং তাতে কলেজ ছাত্র ফারুকের মৃত্যু হয়। অবস্থা আরো উত্তপ্ত হয়। এখন ওই রাস্তাটির নাম শহীদ ফারুক স্মরনি। আমি তখন মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমরাও সবাই রাস্তায় নেমে আসি। এখন সবার দৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর দিকে। উনি কি বলেন, কি নির্দেশ দেন। উনি তাৎক্ষনিকভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানিদের সব কিছু বর্জন করার আদেশ দিলেন। ডাক দিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের। ওনার ডাকে স্কুল- কলেজ, মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালাত, ব্যাংক, সচিবালয় ও বিচার বিভাগ, ট্রেন, বাস, নৌ-যান চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। দেশ এক প্রকার অচল হয়ে যায়। প্রতিদিন মিছিল, মিটিং, রাতে মশাল মিছিল আর তার সাথে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে যাতে পাকিস্তান সেনা বাহিনী এবং তার সহচরদের চলাচল করতে কষ্ট হয়। আর শ্লোগানে শ্লোগানে দেশ গরম। সারা দেশে এক ভীষন উত্তেজনা বিরাজ করছে। এক দাবি, এক দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ইয়াহিয়ার গদিতে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। এ ধরনের আরো অনেক শ্লোগান। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে অফিস আদালত এবং সকল সরকারী ভবন থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সর্বত্র বাংলাদেশের একটা নমুনা পতাকা টানান হচ্ছে। সারাদিন এই কাজ। এর মাঝে আমরা এলাকার ছাত্র বন্ধুরা নিজেরা পয়সা দিয়ে পেট্রোল কিনে হাতবোমা তৈরি করি। উদ্যেশ্য পাকিস্তান আর্মি যদি আমাদের আক্রমন করে আমরাও পাল্টা জবাব দেবো।

বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন পাড়ায় পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলতে আর যার যা কিছু আছে তা নিয়ে তৈরি থাকতে। আর সেই ডাকে প্রতি পাড়াতেই রাতে পালা করে পাহারা দেয়া শুরু হয়ে গেল। আমরাও আমাদের রাজারবাগে নাইট ডিউটি শুরু করলাম। আমি, আমান, নশু, মতি, হারুন, শরিফ, বাবু, এবাদ সবাই তখন পাশাপাশি বাসায় থাকতাম। সাথে পাড়ার বড় ভাইরাও যোগ দিলেন। প্রতিদিনই কারো বাসা থেকে চা-বিস্কুট দেয়া হতো আমাদের জন্য। এই নাইট ডিউটির ফাঁকে মাঝে মাঝে অন্য পাড়ায়ও যেতাম ঘুরতে। কথা বলতাম সমবয়সী বন্ধুদের সাথে। সবার মুখে একই কথা। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এভাবে চলল সপ্তাহ খানেক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলগুলিতে ছাত্র ছাত্রিদের ট্রেনিং শুরু হয়, যুদ্ধের ট্রেনিং এবং পালাক্রমে তা চলতে

থাকে। মুলত গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কলা কৌশল দেখানো ও শেখানো হচ্ছিলো। এর মধ্যে সর্বদলীও মিটিংএ সিদ্ধান্ত হলো যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিবেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের পরবর্তি নির্দেশনা দিবেন। সবাই উন্মুখ হয়ে তা শোনার অপেক্ষা করছে উনি কি বলবেন, কি ঘোষনা আসবে তার মুখ থেকে। সবাইতো স্বাধীনতা চাইছে। উনি কি বলবেন। আর দেখতে দেখতে সেই দিনটি চলে এল।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ।
বঙ্গবন্ধু আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দেবেন আমাদের দিক নির্দেশনা দিবেন। তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানে যা নাকি এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সেখানে হবে এই ঐতিহাসিক ভাষন। সকাল থেকেই লোকে লোকারন্য ময়দান। ১০ লাখেরও বেশি লোক হয়েছিল। আর যারা আসতে পারছেনা তারাও রেডিও টেলিভিশনের সামনে বসে আছে ওই বক্তৃতা শোনার জন্যে। দুপুর তিনটার দিকে শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, পিন পতন নিরবতা, আর মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজে জয় বাংলা শ্লোগান। উনি আমাদের উপর পাকিস্তানীদের চালানো শাষন শোষন ও বৈষম্যের একটি পরিষ্কার চিত্র উপস্থাপন করলেন। আমাদেরকে অনেক ঘটনা খুলে বললেন যা আমরা কোনদিন জানতাম না। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম ওনার বক্তৃতা। এই বক্তৃতাতে একটা যাদু ছিল, একটা সম্মহোনি শক্তি ছিল আর সাড়ে সাত কোটি মানুষের একত্র হবার একটা উদাত্ত আহবান ছিল। মানে উনি যা বলবেন সবাই তাই করতে বা মেনে নিতে একশ ভাগ প্রস্তুত। পরিশেষে উনি ঘোষনা দিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। মানুষ পাগল হয়ে গেল ওনার এই ডাকে। মনে হচ্ছিল এখনই দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এমনই ক্ষমতা ছিল ওনার ওই ঐতিহাসিক ভাষনের। আমাদের তথা সমগ্র দেশবাসীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় যে দেশ স্বাধীন হবেই হবে। পরদিনই মনে হচ্ছিল যে স্বাধীন দেশে বাস করছি। ঐ বক্তৃতার পর পাক সরকারের নিয়ন্ত্রন একেবারেই শেষ যায়। সরকারের কোন আদেশ, নির্দেশ কেউ আর মানছেনা। শুধু হাসপাতাল আর ব্যাংক খোলা রাখার আদেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। অন্যদিকে অঘোষিত সরকারের মত কাজ করছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। তাদের কথাতেই সব চলছিল। কিন্তু কোন চুরি, ছিনতাই এসব ছিলনা। আমরা খুব নিরাপদে ছিলাম।

এমতবস্থায় ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া আর ভুট্টো ঢাকায় আসে শেখ মুজিবের সাথে সংলাপ করতে। মুজিব তাদের আবদার রক্ষা করলেন। উনি বসলেন সংলাপে। মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠক চলছে আর দেশবাসি অপেক্ষা করছে। প্রতিদিনই হচ্ছে মিটিং, কিন্তু কোন ফল আসছেনা। শুধু সময় নষ্ট করা হচ্ছে। দীর্ঘ সাত দিন চলল এই সংলাপ। কিন্তু এর পেছনে ছিল ষড়যন্ত্র। এই সংলাপের ফাঁকে পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন অনেক পাকিস্তানী সৈনিক, অস্ত্র, গোলা বারুদ ইত্যাদি বিমানে করে ঢাকা আসতে লাগলো। এই ফ্লাইটগুলা রাতের আঁধারে আসত, যাতে সাধারণ জনগন দেখতে ও বুঝতে না পারে। দেশ বিদেশ থেকে কয়েকশ সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফার এসেছে এই ঘটনা পর্যবেক্ষন করতে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা ভাবছি আলোচনার মাধ্যমে কিছু একটা হবে, কিন্তু না, কোন অগ্রগতি নেই। সংবিধানে ছিল যে দল সংসদে বেশি আসন পাবে সে দল থেকেই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবে। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের আঃলীগ পেল ১৬০ টা আসন। সুতরাং মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে। এটাই সংবিধান সম্মত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্ট মানলোনা সংবিধানের কথা। তারা প্রস্তাব দিল দুই প্রদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী হবে। পূর্ব পাকিস্তানে হবেন শেখ মুজিব আর পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী

ভূট্ট। মুজিব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করলেন। ছাত্র জনতা মানলনা এই প্রস্তাব। দেশ আরো উত্তাল হয়ে গেল। এর মধ্যে ২৩শে মার্চ ইয়াহিয়া আর ভুট্ট কাউকে না জানিয়ে রাতের আঁধারে গোপনে পালিয়ে গেল করাচি।

এখন কি হবে, কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে ভেগে যাওয়ায় একটা শুণ্যতার সৃষ্টি হলো। এখন আমরাই সিদ্ধান্ত নিব আমরা কি চাই এবং তা আদায় করার জন্য যা দরকার তা করতে সবাই প্রস্তুত। আমরা যুব ও তরুন সমাজ স্বাধীনতা চাই, আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই আমরা আমাদের যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে রেডি হলাম। এরমধ্য গুজব রটলো পাকিস্তান বাহিনী আমাদের অতর্কিতে আক্রমন করবে। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলাচল একদম কমে গেল। ঝড়ের আগে যেমন হঠাৎ বাতাস থেমে যায় ঠিক তেমনি ঢাকা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেল। সরকার নেই, অফিস নেই, স্কুল কলেজ নেই, কোন কর্মসূচি নেই কেমন যেন হয়ে গেল। দোকান পাট বেশির ভাগই বন্ধ করে লোকজন চলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। এক অজানা ভয় কাজ করছে সবার মধ্যে। মুরুব্বিরা যে যার মত চাল ডাল তেল মোমবাতি ইত্যাদি কিনে রাখছেন, ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রাখছেন আসন্ন বিপদের আশংকা করে। কিন্তু তরুন ও যুব সমাজ তাদের মিছিল, মিটিং, ট্রেনিং নিয়ে ব্যাস্ত। মনে হচ্ছিল এ যেন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। আমরা মানে ছাত্র ও যুবকরা কিন্তু ঠিকই প্রস্তুত যুদ্ধ করার। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছি রাস্তা কেটে, গাড়ীর টায়ার জ্বালিয়ে অথবা গাছের গুড়ি ফেলে। জায়গায় জায়গায় ট্রেন লাইন উঠিয়ে ফেলা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় বাংকার তৈরি করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য পাকিস্তানীদের চলচলে বাধা প্রদান করা। আমরাও আমাদের কিছু হাত বোমা, নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত যুদ্ধ করতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষন চলছিল প্রায় পুরা মাস ধরেই। আমাদের ধারনা ছিল পাকিস্তান আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতেই পারবেনা। ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন হলগুলাকে বলতাম দুর্গ। কিন্তু আমাদের সব ধারনা একদম ভুল ছিল। ওদের ছিল সর্ব শেষ প্রযুক্তি, ভারী অস্ত্র, লাখ লাখ গোলা বারুদ আর বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক। আমাদের ছিল অসীম সাহস, আত্নবিশ্বাস, মনোবল, প্রচন্ড দেশপ্রেম আর সাড়ে সাত কোটি জনতার দোয়া ও ভালবাসা। জীবন দিয়ে হলেও দেশ স্বাধীন করবো এরকম একটা ভাব এবং এটাই আমাদের মূল শক্তি। ২৩ ও ২৪ মার্চ কাটালাম এক অজানা আতংক ও উত্তেজনায়, এটাক হবে, আক্রমন হবে, যুদ্ধ হবে, কিন্ত কিছুই হলোনা। আমরা কিন্তু ২৪ ঘন্টা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করছি। কোন নতুন আদেশ, নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। কিছুই হচ্ছেনা তাই খুব অস্থির লাগছে।

২৫শে মার্চ, কালরাত্রি

২৫ তারিখে আবার শুনলাম আজ সত্যি সত্যিই এটাক হবে। ক্যান্টনমেন্ট ও আশেপাশের এলাকায় ভারী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আর্মি ঘুরছে, লাইন দিয়ে ট্যাংক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, সুতরাং সবাই বলাবলি করছে যে আজই আক্রমন হবে। রাতের আঁধারে ওরা আক্রমন করবে। সন্ধ্যা থেকে আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি। এদিকে ছাত্র নেতারাও বলছে যুদ্ধ হবে, রেডি হও। তোফায়েল আহমদ ও শেখ শহীদ ঢাকা শহর ঘুরে ঘুরে সবাইকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা ছাদে বালির বস্তা দিয়ে ডিফেন্স তৈরি করলাম। বালতি বালতি পানি আনলাম। রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে অনেক পুলিশ এসে পজিশন নিল আমাদের ছাদে এবং আসেপাশের বাসার ছাঁদে।। তারাও প্রস্তুত যুদ্ধ

করতে, তারাও স্বাধীনতা চায়। তাদের কাছে আছে একটা করে ৩০৩ রাইফেল। তবুও তারা ছেড়ে দেবেনা, মরতে হলে যুদ্ধ করেই মরবে। আমরাও তাদের সাথে, তাদের পাশে দাড়ালাম। সবার একই দাবি, একই উদ্দেশ্য। ছাদে আমরাও ওদের পাশে অবস্থান নিয়েছি। আমাদের আছে একটা মাত্র ০.২২ বোর রাইফেল, চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে নেয়া। তাই নিয়েই আমরা প্রস্তুত হলাম।

রাত তখন ১১ টার মত হবে। প্রথম গুলির আওয়াজ পাই। আওয়াজটা প্রথমে উত্তর দিক মানে ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে আসল। তারপর আওয়াজের গতি এবং ক্ষিপ্রতা বাড়তে থাকলো এবং ক্রমশ এটা শহরের দিকে এগুতে থাকে। প্রথম প্রথম টাকঢুম, টাকঢুম আওয়াজ, পরে বৃষ্টির মত অনবরত, এবং রাত যত বাড়তে থাকল আওয়াজ ততই বাড়ল। শেষের দিকে মেঘের গর্জনের মত গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ এবং তার সাথে বিদ্যুতের মত আলো। এই অপারেশনের নাম ছিল অপারেশন সার্চ লাইট। এত বিকট আওয়াজ হচ্ছিল যে আমরা আমাদের কথাও শুনতে পারছিলাম না। রাত ১২ টার দিকে ওরা রাজারবাগ পুলিশ লাইন এটাক করা শুরু করল। ওদের প্রচন্ড গোলাগুলি, মর্টার শেল নিক্ষেপ ও ট্যাংক নিয়ে আক্রমনের কারনে আমাদের পুলিশ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমরাও ছাদ থেকে নেমে ঘরে এসে পড়লাম। পুলিশ বাহিনি তাদের অস্ত্র, বুট ও ব্যাজ আমাদের বাসার পাশের পুকুরে ফেলে নিরাপদে চলে যেতে বাধ্য হয়। আর রাস্তার দিকের বাসায় যারা ছিলো সবাই এখন আমাদের বাসাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কারন আমাদের বাসাটা ছিল মূল রাস্তা থেকে সবচেয়ে দুরে এবং এর পর পুকুর। জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে পুকুরে ঝাপ দেয়া যাবে। তাই এটাকেই সবাই নিরাপদ ভাবল। দরজা জানালা সব বন্ধ। আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে। এত বেশি গুলি আর মর্টার শেল নিক্ষেপ হচ্ছে যে মনে হচ্ছিল যে কোন সময় আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো। ক্রমাগত গুলি হচ্ছে আর হচ্ছে, এক মূহুর্তও থেমে নেই। রাত কয়টা বাজে, বাইরে কি অবস্থা, কিছুই বুঝতে পারছিনা। সময় যেন ফুরাচ্ছেনা। আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে আছি অন্ধকার ঘরে। কে কোথায়, কিছু জানিনা, বলতে পারিনা, লাইট নাই, দেখাও যায়না। এর মধ্যে আমাদের মনে হলো যে চোখ জ্বলছে আর শ্বাস কষ্ট হচ্ছে, তাও চুপ করে শুয়েই আছি, কিন্তু একসময় দেখি যে আর শ্বাস নিতে পারছিনা, বোঝা গেল যে ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। শ্বাস কষ্টে মারা যাবার উপক্রম, ঘর ভর্তি মানুষ। আমাদের তিনটা ঘরে প্রায় ৩০ জনার মত বিভিন্ন বয়সী মানুষ। উপায় না দেখে পেছনের দরজা জানালা খুলে দিলাম, তাও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর পারা যাচ্ছেনা ঘড়ে থাকতে, জীবন যেতে পারে জেনেও বের হয়ে এলাম সবাই, পেছনের উঠানে। আম্মা আর খালাম্মার বয়স ৭০ এর উপর, দুই ভাবী অন্তসত্বা। সাথে ছোট ছোট বাচ্চা। বন্ধ ঘরে শ্বাস কষ্টে সবা মারা যাবার উপক্রম। তাই সবাই বেরিয়ে এসেছি। উঠানে এসে দেখি আগুনের লেলিহান শিখা, প্রায় দশ তালার সমান উঁচু হবে, পুলিশ লাইনের ব্যারাকগুলা সব জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পুরা পুলিশ লাইনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে পাক আর্মি। পুলিশরা পালিয়ে যাচ্ছে যার যার মত। আমাদের বাসার উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর বলছে যে সব মেরে ফেলেছে, সব মেরে ফেলেছে। পুলিশ লাইনে কেউ আর বেঁচে নেই। কি ভয়ংকর খবর। একটু পর হয়ত আমাদেরকেও মেরে ফেলবে। কিন্তু আমাদের আর পালাবার উপায় নেই। এক আল্লাহ ভরসা। আমরা এখন সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, যে কোন সময় পাক আর্মির গুলিতে মারা যেতে পারি। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী পাক আর্মি কোন বাড়িতে ঢুকেনি, তারা মূল সড়কগুলাতেই ছিল। সারারাত এই আগুন জ্বলল। আমরা অতি কষ্টে বাইরে দাঁড়িয়ে রাত পার করলাম। ধোঁয়ায় চোখ খুলে রাখা যাচ্ছিলনা। আর শ্বাস কষ্টতো হচ্ছিলই, তাও বেচে

থাকার প্রচন্ড প্রচেষ্টা। সময় এগুচ্ছিল আর একসময় ভোরের আলো দেখতে পেলাম। সকালের দিকে গোলাগুলি অনেক কমলো কিন্তু থেমে যায়নি, গুলি চলছিলই, আর থেমে থেমে বিকট আওয়াজ হচ্ছিল। মানে ট্যাংক বা মর্টার দিয়ে বড় বড় বিল্ডিং ভাঙছে। এর মাঝে আমাদের বাসার কাজের ছেলেটা, নাম তার নুরু, সে দেখি সবার জন্য রুটি আর আলু ভাজি তৈরি করে নিয়ে এসেছে। বলে মামা কিছু খেয়ে নেন সবাই, দুপুরে খাবার সুযোগ নাও পেতে পারেন। আমরাও সবাই মিলেই খেলাম। ধীরেধীরে সকাল হলো। খুব সাবধানে রেডিও খুললাম। শুনলাম জরুরী সংবাদ। ২৪ ঘন্টা কার্ফিউ জারী করা হয়েছে, আর তার সাথে সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাক আউট মানে বাতি জ্বালানো যাবেনা। কার্ফিউর সময় দেখা মাত্র গুলি করার আদেশ দিয়েছে মিলিটারি জান্তা। বুঝলাম আজ সারাদিন বাসায় বন্দি। গত একমাসে যে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আজ তার ইতি। আম্মা আর আমার বড় ভাই আমাকে সাবধান করে দিলেন যেন কোন অবস্থায় রাস্তার দিকে অথবা রাস্তা থেকে দেখা যায় এমন কোন অবস্থানে যেন না যাই। বারে বারে সতর্ক করছেন। মনটা ভীষন খারাপ হয়ে গেল। আমরা হেরে গেলাম। এখন পাকিদের দাসি হয়ে থাকতে হবে।

ওরা রাতের অন্ধকারে ট্যাংক, মর্টার এবং ভারি অস্ত্র নিয়ে আক্রমন করেছিল আমাদের নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগনের উপর। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিডিআর, আনসার ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়, বিভিন্ন ছাত্রাবাস, বংশাল, শাখারি পট্টি, মালিটোলা, মসজিদ, মন্দির এবং আরো অনেক জায়গায় তারা গুলি করে মারল হাজার হাজার মানুষকে। আগুন দিল পুলিশ লাইনে। আগুন দিল বাজারে, বস্তিতে। মসজিদ, মন্দির, আবাসিক হোস্টেল, সি আই ডি অফিস, রেইসকোর্সে অবস্থিত সবচেয়ে পুরান কালী মন্দিরটি গুড়িয়ে দিল মাটির সাথে। পুলিশ ব্যারাকে পুড়ে মারা গেল অনেক পুলিশ ভাই। পরদিন ২৬শে মার্চ দিল ২৪ ঘন্টার কারফিউ। এই কারফিউর মধ্যে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গেল অনেক নেতা ও যুবক যুবতীদের। আমরা ঘরে বন্দি। রেডিও খুললাম। শুনলাম ইয়াহিয়ার ভাষন। বলল গাদ্দার মুজিবকে আটক করা হয়েছে। সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং আওয়ামীলীগ নিষেধ করা হোল। আইন অমান্যকারিদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। মনটা একদম ভেঙ্গে গেল। এক বিষন্নতা নিয়ে সারাদিন পার করলাম। রাতে খবরে বলল যে আগামিকাল ২৭শে মার্চ সকাল ১০টা থেকে সকাল ১২টা,
এই দুই ঘন্টার জন্য কারফিউ থাকবেনা। একটু ভাল লাগল। ঠিক করলাম তখন শহর দেখতে বের হব।

২৭শে মার্চ।
সকাল ৭ টার দিকে রেডিও ঘুরাচ্ছি। হঠাৎ ভাংগা ভাংগা আওয়াজ, শুনলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, শুনেই সটান হয়ে বসলাম, ঘোষনা দিচ্ছেন মেজর জিয়া। ওনি বললেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সবাইকে যুদ্ধে যোগদান করতে এবং কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানালেন। রক্তের মধ্যে একটা বিদ্যুত তরঙ্গ প্রবাহিত হোল। মনে হল, না আমরা হেরে যাইনি, এখন যুদ্ধ করতে হবে এবং জিততে হবে। খুবই পুলকিত অনুভব করলাম। এত ভয়ানক অবস্থার মধ্যেও একটু আশার আলো দেখতে শুরু করলাম। মনে কিছুটা হলেও আনন্দ অনুভব করলাম, একটু সাহস আসল মনে। মাঝে মাঝে অল্প আওয়াজ দিয়ে রেডিও শুনতে থাকলাম। ভাল বোঝাও যায়না। তাও ভাল লাগে। আবার ভয়ও লাগে, যদি পাক আর্মি জেনে ফেলে তাহলেত নির্ঘাত মৃত্যু।

সকাল ১০টা থেকে দু ঘন্টার জন্য কার্ফিউ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি আর আমার বড় ভাই (আতিকুর রহমান) মোটর সাইকেল নিয়ে বের হলাম শহর দেখতে। প্রথমে যেটা নজর কাড়লো সেটা হোল আমাদের গলির মুখে বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত মাঝারি আকারের নাম না জানা গাছটি। জন্ম থেকে এই গাছটা দেখে আসছি। এই গাছের নিচে আমরা অনেক আড্ডা দেই, এর ছায়াতে কত পাখী কত পথিক বিশ্রাম নেয়, আর আমরা অনেককেই বলি যে ওই গাছের গলিতেই আমাদের বাসা, সেই অতি পরিচিত ও প্রিয় গাছটা পুড়ে একদম কয়লা হয়ে গেছে। ভিষন খারাপ লাগল। তারপর দেখলাম যে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। মনে হলো অনেকদিন পর এই পাকিস্তানী পতাকা দেখলাম। দেখলাম আমাদের অতি পরিচিত পুলিশ লাইনটি পুঁড়ে ছাই, ওখানে কাবাবের মত মানুষ পোঁড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশ লাইনের ৩ নম্বর গেইট অবস্থিত মসজিদে গিয়ে দেখি এক ব্যাক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে সেঁজদারত অবস্থায় মরে পরে আছে। সি আই ডি অফিসে মর্টার দিয়ে বিরাট বিরাট গর্ত করে ফেলেছে দেয়ালগুলাতে। পুলিশ লাইনের ১ নম্বর গেইটে পাক আর্মি পাহারা দিচ্ছে কিন্তু ৩ নম্বর গেইটে কোন পাহারা নেই। চলে গেলাম শহর দেখতে। ধোঁয়া উড়ছে জায়গায় জায়গায়, পুঁড়ছে বাজার, পুঁড়ছে দোকান, পুঁড়ছে স্কুল কলেজ। নয়াবাজারে কোটি কোটি টাকার কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।
বিভিন্ন হলে গেলাম, ইকবাল হলে গিয়ে দেখলাম ১১ টা মৃত দেহ একসাথে। ইউনিভারসিটির অনেক শিক্ষককেও অরা গুলি করে মেরেছে। অনেক বিল্ডিংএ গুলি আর মর্টার শেলের চিহ্ন। রাজারবাগের চারপাশে সব বিল্ডিংএ গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম। মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধ বিদ্ধস্থ এক শহরে ঢুকেছি। মানুষের মনে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর ছোটাছুটি। কি হয়ে গেল ২৫শে মার্চ রাতে। কেউ খুঁজছে তার প্রিয়জন, কেউবা তার বন্ধু, আবার কেউ হারিয়েছে তার ছেলেকে, আবার কেউবা তার ঘরবাড়ি। একটা অনিশ্চিয়তা, ভয় আর হতাসা নিয়ে লোক ছোটাছুটি করছে। এক করুন পরিস্থিতি। সবাই আক্রান্ত, প্রভাবিত। আমরা দু ঘন্টা ঘুরে আবার বাসায় চলে এলাম। আবার বন্দী হয়ে গেলাম ঘড়ের মধ্যে। পরে দেখলাম আমাদের সামনের বাসায় যেটা আমারই বড় ভাইয়ের বাসা সেটার ঘরের ছাদের উপরে চিলেকোঠায় কয়েকটি গুলির চিহ্ন।
এর পর ৪-৫ দিন খুবই খারাপ সময় ছিল আমাদের সবার জন্যই। আমরাও বাসা ছেড়ে বাংলা মোটরে আমার এক ভাগ্নী সাফিয়ার বাসায় আশ্রয় নিলাম, কারন কারফিউ দিয়ে ওরা ধরে নিয়ে যেতে লাগল যুবকদের। কাকে ধরবে কেউ জানেনা, আবার পালাবার পথও বন্ধ। ওই সময়টা ছিল ভীষন ভয়ের এবং এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন পার করছিলাম। বাসা থেকে বের হওয়া নিষেধ। রাতে লাইট জ্বালানো যাবেনা। জোরে কথা বলা যাবেনা। পাড়ার আড্ডা বন্ধ। একপ্রকার গৃহবন্দী। মানে সারাদিন চুপ করে বাসায় বসে থাকতে হয়, খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। রাতেও ভয় লাগে, মনে হয় এই বুঝি আর্মি আসল।

আমাদের যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এভাবে আর থাকা যায়না। আমি আর আমার বড় চাচাত ভাইয়ের ছেলে আমান, আমার সমবয়সী ও সহপাঠী চলে গেলাম রামপুরাতে, ওখানে আমার ভাবীর দু ভাই থাকতেন। থাকলাম আর তিন চার দিন। এই অবস্থায় কয়েকদিন পার করলাম বহু কষ্টে।

প্রভাকরদী
অবশেষে সম্ভবত ১লা এপ্রিল, ৮ ঘন্টার জন্য কারফিউ ওঠালো, আমরা সেই সুযোগে চলে গেলাম আমাদের গ্রামের

বাড়ি প্রভাকরদী। প্রভাকরদী হচ্ছে বর্তমান নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানায়। ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে। আমি এবং আমার চার আত্নীয়, আমার ভাবীর দুই ভাই ও এক মামা, ইনু আর টিপু ভাই, মঞ্জু মামা আর আমার ভাতিজা আমান এবং রব। আমরা প্রথমে গুলিস্তান থেকে বাসে যাই কাঁচপুর, ওখানে নদী পার হই নৌকা দিয়ে এবং এরপর প্রায় ১০ মাইল রাস্তা হেঁটে চলে যাই সোনারগাঁ। সোনারগাঁয়ের মোগরাপারায় আমার এক ভাইয়ের বাসায় উঠি। তখন বিকাল হয়ে গেছে। ওনারা হঠাৎ আমাদের দেখে অবাক। সবার খবরাখবর নিলেন। আমরা হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেই, কিছু চা নাস্তা খাই। পরে রাতের খাবার খেয়ে সবাই ওখানে রাত কাটাই, পরদিন সকালে আবার নাস্তা করে ওখান থেকে প্রায় চার মাইল রাস্তা হেঁটে মদনপুর আসলাম। মদনপুর থেকে আড়াইহাজারের যে ট্রেন লাইন ছিল সেই লাইন ধরে ১০ মাইল রাস্তা হেঁটে আমরা এসে পৌঁছাই প্রভাকরদি গ্রামে। এখানে সবাই আমাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে গ্রহন করল। খাবার খাওয়াল, ঢাকার খবর শুনল। রাতে আমাদের বাড়িতেই ক্ষড়ের উপর পাটি বিছিয়ে ঘুমালাম। অনেক মশা, কিন্তু তারপরও কি শান্তি। অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি। কোন টেনসন নাই। কিন্তু তারপরও চিন্তা ছিল, ঢাকায়তো আমার সবাই, আম্মা, ভাই, ভাবি ভাতিজা। তাদের কথা মনে হচ্ছিল। গ্রামে ৮-৯ দিন থাকার পর আর পারছিলামনা। এরমাঝে টিপু ভাই চলে গেলেন মঞ্জু মামার সাথে। পরে জানলাম ভারত চলে গেছেন। কতদিন অন্যের উপর খাবো? ভাল লাগছিলনা। আমরাই বা থাকবো কিভাবে। টাকা পয়সাতো আর নিয়ে আসিনি। ফিরে এলাম আবার ঢাকার রাজারবাগে।

এবার আস্তে আস্তে নিজেকে খাপ খাওয়াচ্ছি। সব নিয়ম মেনেই চলছি। তবুও আম্মা আর বড় ভাইদের বকা খাচ্ছি নিয়মিত ভাবেই। এরমধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হচ্ছিল। ব্যাংক, অফিস শুরু করতে কড়া আদেশ দিয়েছে ইয়াহিয়া সরকার। স্কুল কলেজ খুলতেও বলেছে। যদিও ছাত্ররা এই ডাকে সাড়া দেয় নাই। তবে কিছুটা ভয় কমেছে। পাড়ার আড্ডাটা আবার শুরু করলাম। দিনের বেলায় কারফিউ নেই। রাতে লাইট জ্বালান যায়। জোরে কথা বলা যায়। এখন আর ফিস ফিস করে কথা বলতে হয়না। তাই আর তেমন কষ্ট মনে হয়না। বেশ কিছুদিন পার হয় গেল। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শুনি। মাঝে মাঝে বোমা ফোটার আওয়াজ পাই। এরমধ্যে চে গুয়েভেরার আত্ন জীবনি পেলাম আর সেটা পড়া শুরু করলাম। এত আকর্ষণীয় এবং উদ্দীপক ছিল যে এক বসাতেই শেষ করে ফেললাম। বইটা পড়তে পড়তে নিজেকেই চে ভাবছিলাম। আর এ বইটা পড়ে মুক্তিযুদ্ধে যাবার আগ্রহ উগ্র হলো। চিন্তা চেতনায় শুধু মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধ। যদিও খুবই প্রাথমিক অবস্থা, তারপরও যাবার আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে এখন আমাদের সময় কাটানর প্রধান উপায় হচ্ছে পাড়ায় আড্ডা দেয়া আর ঘরে ফিরে রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনা।

১৭ই এপ্রিল

কুষ্ঠিয়ার মেহেরপুর আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজুদ্দিন আহমদ প্রধান মন্ত্রী এবং এম এ জি ওসমানি প্রতিরক্ষা বাহিনির সর্বাধিনায়াক হলেন। তারা দেশের ছাত্র ও তরুন সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে আহবান জানালেন।

এই ভাবে মাস দুয়েক পার হয়ে গেল। একবার আমি আর আমান এপ্রিল মাসে ভারত যাত্রা শুরু করেও বিফল

হলাম। লেখাপড়াও বন্ধ। এর মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দেশের তরুন ও ছাত্র সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য আহবান করছে। ওখানে সাংবাদিক এম আর আক্তার মুকুল (চরম পত্র) নামে একটা প্রতিবেদন পড়েন। দারুন মজার। উনি সেখানে মুক্তিদের সব মজার মজার কাহিনী শোনান। মুক্তিদের উনি বিচ্ছু বলতেন। ওখানে একটা কথা উনি সবসময়ই বলেন, যে মুক্তিরা আপনার আশেপাশেই আছে। তাদের সাহায্য করুন। আমি ভাবি কই এই বিচ্ছুরা? তাদেরকেতো দেখিনা, কিন্তু বোমা ফোটার আওয়াজতো রোজই পাই। ওরা কই, দেখতে কেমন? কিভাবে ওরা থাকে আর এই কাজগুলা করে? ভাবলাম যে নাহ, আর নয়, মুক্তিযুদ্ধে যেতেই হবে। আমিও ওদের মত হব। কিন্তু কিভাবে যাবো। কার সাথে যাবো? কার কাছে যাবো?

এরকম যখন চিন্তা করছি আর খুঁজছি কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, তখন হঠাৎ করেই একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয় রাস্তায়। আমি ওকে বাসায় নিয়ে আসি। ও আমার কলেজের বন্ধু, নাম বাবুল, আমার খুব ভালো বন্ধু। ওর সাথে অনেকক্ষন গল্প হয়। যাবার সময় ও বলে যে সে একজন মুক্তি। ভারত থেকে ট্রেনিং এবং অস্ত্র নিয়ে এসেছে, এই বলে সে কোমরের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে দেখাল। আমি অবাক হয়ে অনেক্ষন তাকিয়ে থাকি ওরদিকে। খুব শিহরন লাগছিলো। কারন এই প্রথম এক মুক্তি দেখলাম। ও আমাকে বলে, কি দেখছিস? আমার ঘোর কাটতে আমি বলি যে, না তোকে দেখছি। পরে ও জিজ্ঞেস করে আমি যেতে চাই কিনা। আমি বলি হ্যা, অবশ্যই। কিন্তু কিভাবে যাবো? সে আমাকে আগরতলা যাবার কিছু ধারনা দেয়। কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কোন কোন রাস্তায় যাওয়া যায়, কেমন টাকা পয়সা নিতে হবে, কেমন কাপড় চোপর নিতে হবে ইত্যাদি। যাবার আগে আমাকে বলে যে আগামিকাল বা পরশু ও আবার যাচ্ছে অস্ত্র, গোলা বারুদ আনতে। তারপর বলে যে ভারতে আমি যদি কাউকে চিঠি দিতে চাই তবে ওর হাতে দিতে পারি। সে ওখানে গিয়ে পোস্ট করে দিবে। আমার সাথে সাথে মনে হলো আমার চাচাত বোন আনিসা আপার কথা। দুলাভাই তখন কোলকাতায়। দৌড়ে গেলাম পাশের বাসায়। বললাম আনিসা আপাকে। উনি ভয় পেলেন, যদি আবার ধরিয়ে দেয়। আমি ওনাকে অভয় দিলাম। আনিসা আপা চিঠি দিলেন এবং দুলাভাই ওটা পেয়েওছিলেন। চিঠি নিয়ে আমার বন্ধু আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এই বন্ধুটি পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়।
(আর দেখা হয়নি তার সাথে আমার। আমি মুক্তি হয়ে আগরতলা থেকে আসার পর দুবার সে আমার সাথে দেখা করতে আমার ক্যাম্প ইছাপুরায় আসে। কিন্তু আমাকে পায়নি। পরে ০৪ ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যায় বাবুল আর বাকী, একই গ্রুপের দুজন, স্থানীয় রাজাকারদের হাতে ধরা পরে এবং রাজাকাররা তাদের হাত-পা ও চোখ বেধে মেরে রাস্তার পাশে একটা ড্রেইনে ফেলে রাখে। আমার বন্ধুটি শহীদ হয়। আর সেদিনই আমি আমার ক্যাম্পে যাবার সময় এই দুটা লাশই দেখি, কিন্তু চিনতে পারি নাই। লাশগুলা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল এবং পানির উপর ভাসছিল। ক্যাম্পে গিয়ে শুনলাম এদের একজন ছিল বাবুল। আমার কান্না এসে গেল। আল্লাহ তাদের বেহেস্ত নসীব করুন।)

বাবুল আমার বাসা থেকে চলে গেল, আর আমি বসে বসে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম, যে আমি মুক্তি হয়েছি, আমার

হাতে স্টেনগান, গ্রেনেড, আমি যুদ্ধ করছি। প্রতিজ্ঞা করলাম যে এবার মুক্তিযুদ্ধে যাবোই। যেতেই হবে। কেউ আমাকে আর থামাতে পারবেনা। আম্মাকে বললাম। আম্মাতো রেগে গেলেন। বললেন কি বলিস তুই? তোর বড় ভাই পাকিস্তান নেভিতে, গৃহবন্দী। তুই যুদ্ধে গেলেতো ওকে মেরে ফেলবে। আর দুই বোনও পাকিস্তানে। সুতরাং এই চিন্তা মাথা থেকে বাদ দে। আমিতো মানছিনা আম্মার যুক্তি। প্রতিদিন এই নিয়ে ঝগড়া। বড় ভাই বকেন, আম্মা বকেন, কিন্তু আমি একই কথা বলি, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যাবোই। এভাবে চলল আরও কিছুদিন।

এরমধ্যে পারার দুই বন্ধুর সাথে পরামর্শ করলাম। ওরাও যেতে আগ্রহী। তিন জন মিলে একসাথে যাবো। মনে সাহস আসল, জোড় বাড়লো। এখন আর আমাদের কেউ আটকাতে পারবেনা। ভেতর ভেতর একটা আনন্দ, উত্তেজনা উপলব্ধি করছিলাম। কিন্তু টাকা কই পাব? আম্মাতো দেবেন না। তারপরও চেষ্টা করতে হবে। বললাম আম্মাকে যে আমি যাবোই, আর যেতে কিছু টাকা লাগবে। খুব দৃঢ় ভাবে বললাম। আম্মা যেন একটু থেমে গেলেন। বললেন আমার কাছে টাকা কই বাবা। আমি কি চাকরি করি? বুঝলাম আম্মা টাকা দিবেন ন। আর আম্মারতো আসলেই কোন টাকা নেই। ভাইরা না দিলে পাবেন কোথায়? তাই টাকা জোগাড় করতে একদিন আমি একদিন বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারে আমার ছোট খালাম্মা থাকতেন। ওনার কাছে যাই এবং বলি যে খালাম্মা কিছু টাকা দরকার। কেন লাগবে বাবা, জিজ্ঞেস করতে বললাম যে মুক্তিদের দিবো, আমরা যাবো এই কথা বলিনি। ওনাকে কুটি খালাম্মা বলতাম। উনি এটা শুনে ওনার কাছে অল্প যা ছিল তাই দিয়ে দিলেন, বললেন বাবা সাবধানে থাকিস। খালাম্মাও কিন্তু একা, মানে বিধবা এবং ছেলের সংসারে থাকেন। আমার মনে হয় ৫৫ টাকার মত পেয়েছিলাম। তাই পেয়েই আমি মহা খুশী। আম্মাকে আর জ্বালাতে হবেনা। আর নশু ওর ভাবির টাকা চুরি করে নিয়ে আসে। মানে ভাবি ওকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন কাউকে দিতে, ও সেটা তাকে না দিয়ে নিজেই নিয়ে নেয়। শরিফ তারটা ব্যাবস্থা করে।

আমরা তিন বন্ধু, একজন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হুসেইন আগা শরিফ, অপরজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমিনুল ইসলাম নশু, আর আমি মাসুদুর রহমান তারেক, মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সবাই তখন রাজারবাগে পাশাপাশি বাসায় থাকি। আমরা নিয়মিত বসি এবং অতি গোপনে আগরতলা যাবার পরিকল্পনা করি। কোন রুটে যাবো, কোথায় রাত কাটাবো, কাদের সাথে যোগাযোগ করবো, কি খাবো, কি কাপড় নিবো ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দফায় দফায় আলোচনা চলছে অত্যন্ত গোপনে। সবাই একমত যে টাকা লাগবে। এখন কে কত টাকা জোগার করতে পারবে সেটা অতি গুরত্বপুর্ন। আম্মার হাতে কোন টাকা পয়সা নেই জানি, তাও জোর করি, কারন আম্মা হয়ত ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দিবেন। তবে টাকা পাই বা না পাই আমরা যাবোই এ ব্যাপারে সবাই একমত। সব কিছু গুছিয়ে একদিন সিদ্ধান্ত হলো যে আগামিকাল রাতের আঁধারে পাড়া ছাড়বো, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

আমি আর শরিফ আগে যাবো, পরে নশু যোগ দিবে। সেইমত নশু ওর ব্যাগটা রাতেই শরিফকে দিয়ে যায়। যথারীতি আমি আম্মাকে শেষ বারের মত জানালাম যে আজ গভীর রাতে রওয়ানা দিবো, কাল সকালে আর আমাকে পাবেননা। টাকা না দিলে এমনিতেই চলে যাবো। না খেয়ে থাকবো। আমি আর আম্মার চেহারার দিকে

তাকাইনি। আম্মা শুধু বললেন কেমনে যাবি আর কবে আসবি। আমি উত্তর দেই নাই। রাতে ঘুমাবার আগে আম্মা আমাকে শুনিয়ে পাশের ঘরে থাকা আমার বড় ভাইকে বললেন আলমারিতে ৭৫ টাকা আছে ড্রয়ারের ভেতর। বুঝলাম এটা আমাকেই শোনাচ্ছেন, আর টাকাটা আমার বড় ভাই মানে আমার ছোড়দাই (বিমানের ক্যাপ্টেন মশিউর রহমান) হয়ত আম্মাকে দিয়েছেন আমাকে দেবার জন্য। আমি রাত চারটায় উঠলাম, টাকাটা যথাস্থান থেকে নিলাম। আম্মা কিন্তু সজাগ, কিন্তু কিছু বলছেন না। ঘুমের ভান ধরে থাকলেন। আমি ব্যাগে একটা প্যান্ট-সার্ট, লুংগি আর গামছা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, সে ব্যাগটা নিলাম। এবার আম্মাকে বললাম আমি যাচ্ছি। আম্মা চুপ করে শুধু দরজা খুলে দাড়িয়ে থাকলেন। আম্মা নিশ্চুপ, সম্ভবত চোখে পানি ছিল, আমি বিদায় নিলাম, তখন বাইরে অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারে বের হয়ে গেলাম। আম্মা দাঁড়িয়েই ছিলেন, দড়জা বন্ধের আওয়াজ আর পেলামনা। হয়ত অন্ধকারেও আমাকে দেখছিলেন। আমি আর পেছন ফিরে তাকাইনি।

বের হয়ে আমি আমাদের পুর্ব নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসে শরিফের জন্য অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষন পর শরিফ এল। নশু এসে বলল তোরা রওয়ানা দে, আমি পরে আসছি, ওর বাবা তখন নামাজ পড়ে হাঁটাহাটি করছেন, সুতরাং খুব সাবধানে যেতে হবে যেন উনি দেখতে না পান। আমরা দুজন গুলিস্তান গিয়ে নশুর জন্য অপেক্ষা করছি। প্রায় ঘন্টা খানেক পর দেখি নশু আসছে। ওকে নিয়ে এক বাসে করে আমরা ডেমরা চলে গেলাম। ওখানে এক চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। তারপর দেখলাম আমাদের সবার কাছে কত টাকা আছে। দেখলাম সব মিলিয়ে মোট ৩০০ টাকার মত আছে। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে, আসলে আরো কিছু ছিল, কিন্তু আমরা সবাই কিছু কম করে বলেছি যেন বিপদের সময় এই অঘোষিত টাকাটা কাজে লাগাতে পারি। এটার প্রমান আমরা পরে আস্তে আস্তে পাই। যাই হোক তাই নিয়ে আমরা তিনজন ডেমরা থেকে বাসে বুলতা যাই এবং ওখান থেকে হেঁটে আমার দেশের বাড়ি প্রভাকরদিতে গেলাম। প্রভাকরদি হচ্ছে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার একটি গ্রাম। দুপুরের দিকে গিয়ে বাড়ি পঁউছলাম। ওখানে আমাদের বাড়িতেই পাটির নিচে খড় বিছিয়ে থাকার বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করি। আর যেহেতু অনেকেই তখন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাই খাবার পেতে অসুবিধা হয়নি। এভাবে তিন চার দিন কাটালাম।

.....

সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

২য় পর্ব

১৯৭১

আগরতলা যাত্রা

জুলাই মাসের ১৮ তারিখ, সন্ধ্যাবেলা আমরা গোপনে ঠিক করলাম যে আগামীকাল মানে ১৯ জুলাই খুব ভোরে রাজারবাগ থেকে বের হবো। প্রথমে আমার গ্রামের বাড়ি, নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত প্রভাকরদী গ্রামে যাবো। ঢাকা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার, আর তখন যেতে লাগত প্রায় ৪-৫ ঘন্টা। আমি আর শরিফ আগে যাবো, পরে নশু যোগ দিবে। সেই মত নশু ওর ব্যাগটা রাতেই শরিফকে দিয়ে যায়। যদিও সবাই বাসায় কাউকে না জানিয়ে অতি গোপনে যাবার পরিকল্পনা করেছিল, আমি কিন্তু আম্মাকে জানিয়েই গেছিলাম। আম্মা যাবার সম্মতি দেন নি, তবে মানাও করেন নি। সে রাতে আম্মাকে শেষ বারের মত জানালাম যে, কাল খুব ভোরে আমি যাচ্ছি, সকালে আর আমাকে পাবেন না। কিছু টাকা দিলে ভাল, আর না দিলে খালি হাতেই চলে যাবো। না খেয়ে থাকবো। আমি আর আম্মার চেহারার দিকে তাকাইনি। আম্মা শুধু বললেন কেমনে যাবি আর কবে আসবি। আমি আর উত্তর দেই নাই। সে রাতে একটুও ঘুমাইনি, যদি উঠতে না পারি। রাতে শোবার আগে আম্মা আমাকে শুনিয়ে পাশের রুমে থাকা বড় ভাইকে বললেন আলমারিতে ৭৫ টাকা আছে ড্রয়ারের ভেতর। সকালে ওটা নিস। বুঝলাম আসলে এটা আমাকেই শোনাচ্ছেন, আর টাকাটা হয়ত আমার বড় ভাই মানে আমার ছোড়দা (বিমানের ক্যাপ্টেন মশিউর রহমান) আম্মাকে দিয়েছেন আমাকে দেবার জন্য। আমি রাত চারটায় উঠলাম, টাকাটা নিলাম। আম্মা বুঝলেন কিন্তু চুপ। ঘুমের ভান ধরে থাকলেন। আমি আমার ব্যাগ, যেটা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলাম সেটা নিলাম। এবার আম্মাকে বললাম আমি যাচ্ছি। আম্মা উঠে দরজা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আমাকে কিছু বলছেন না। দরজা দিয়ে বের হবার সময় আমি আবার বললাম আম্মা আমি যাই আম্মা গম্ভীর মুখে শুধু বললেন যাওন নাই বাবা, আস। সম্ভবত চোখে পানি ছিল, আমি বিদায় নিলাম, তখন বাইরে অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারে বের হয়ে গেলাম। আম্মা দাঁড়িয়েই ছিলেন, দরজা বন্ধের আওয়াজ আর পেলাম না। হয়ত অন্ধকারেও আমাকে দেখছিলেন যতদুর দেখা যায়। কে জানে আর কোনোদিন আমাকে দেখবেন কিনা। আমি আর পেছন ফিরে তাকাইনি। যাত্রা শুরু হলো।

১৯ জুলাই

ভোর ৪.৩০ টায় ঘর থেকে বের হয়ে আমি আমাদের পুর্ব নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসে শরিফের জন্য অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষন পর শরিফ এল। তারপর নশু এসে বলল তোরা রওয়ানা দে, আমি পরে আসছি, ওর বাবা তখন নামাজ পড়ে হাঁটাহাঁটি করছেন, আমরা দুজন গুলিস্তান গিয়ে নশুর জন্য অপেক্ষা করছি। প্রায় ঘন্টা খানেক পর দেখি নশু আসছে। ওকে নিয়ে আনুমানিক ৮ টার দিকে এক বাসে করে আমরা ডেমরা চলে গেলাম। ডেমরা থেকে নদী পার হয়ে তারাবো। এখানে কিছুটা নিরাপদ হলেও ডেমরা ঘাটে আর্মি আছে, আর তার সাথে শীতলক্ষা নদীতে আর্মির পেট্রল বোট মাঝে মাঝে টহল দেয়। তাই ওখানে আর সময় নষ্ট না করে আমরা বাসে করে সিলেট রোড

দিয়ে ৭-৮ মাইল পথ গিয়ে ভুলতায় নামি। ভুলতায় একটু বিশ্রাম নেই, চা নাস্তার বিরতি বলা যায়। এখানে তখনও আর্মি আসে নি। তবে গ্রামের দিকে শান্তি বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী তৈরী হচ্ছিল। তারপর প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে আমার দেশের বাড়ি আড়াইহাজার থানার প্রভাকরদিতে পৌঁছি। তখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। বাড়িতে ঢোকার একটু আগে বাজারের সামনে আমার সবচেয়ে বড় চাচাত ভাই, তার নাম পন্ডিত মিয়া আমাকে দেখেন এবং ডেকে বসান। উনি ঢাকার খোঁজ খবর নেন, আর দুপুরে ওনার বাসায় খেতে বলেন। তাই প্রথমে ওনার বাসায় গিয়ে দুপুরের খাওয়াটা খাই। ওনাকে বললাম যে আমার গ্রামের বাড়ী দেখাতে বন্ধুদের নিয়ে এসেছি। কারন সময়টা এমন ছিল যে কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। আর আমার ঐ ভাই আবার মুসলিম লীগ করতেন এবং পাকিস্তান সমর্থক বলে জানতাম। তাই তাকে এভাবেই বললাম। এরপর আমরা আমাদের মূল বাড়িতে যাই, খুবই ময়লা ছিল ঘর। লোক ডেকে ঘর পরিষ্কার করাই, হারিকেনের জন্য তেল কিনি, খাবার পানির ব্যবস্থা করি আর যেহেতু আমাদের তোষক নেই, তাই পাটির নিচে খড় বিছিয়ে রাতে থাকার ব্যবস্থা করি। সে সময় অনেক আত্নীয়-স্বজন গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাই খাবার দাবার বা রান্নার কোন চিন্তা আমাদের করতে হয়নি। বেশির ভাগ সময় আমার ছোট চাচার বাসায় অথবা ফরহাদ (আমার এক ভাতিজা ও সম বয়সী) এর বাসায় খেতাম।

তবে যে কারনে এখানে আসা তা ছিল আগরতলা যাবার রাস্তার খোঁজখবর নেয়া এবং একটা নিরাপদ পথ চুড়ান্ত করা। গ্রামের বাড়িতে তখনও আর্মির ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে এই কাজটা করা যাবে। এখানে আগে থেকেই হারুন, এবাদ ও ফরহাদ ছিল। ওরা আবার আপন চাচাত ভাই ও আমার ভাতিজা, ফরহাদ ঢাবীতে ফার্মেসির প্রথম বর্ষের ছাত্র আর এবাদ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের, দুজনই আমার সহপাঠি। ফরহাদ গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল চেনে। তাই আমরা ওর সাহায্য চাইলাম। ও আমাদের মোটামোটি একটা রাস্তা বলে দিল, যেটা নিরাপদ হবে। তারপরও আমরা তিন দিন থাকলাম দেশে। পরিশেষে ঠিক হলো যে গোপালদি হয়ে কুমিল্লার হোমনা যাবো, হোমনা গিয়ে স্থানীয় আঃলীগ কর্মিদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাবো। গোপালদী হচ্ছে আড়াইহাজার থানার পুর্ব দিকের শেষ প্রান্তে মেঘনা নদীর পারে। এই নদী পার হলে কুমিল্লা জেলা। পুরা পথটাই হেঁটে এবং নৌকায় যেতে হবে। যায়গায় যায়গায় আর্মি আছে, সুতরাং অতি সাবধানে মনোবল, ধৈর্য আর সাহস নিয়েই এই পথ পারি দিতে হবে।

২২ শে জুলাই, ১৯৭১

সকাল ৪ টায় শুরু করলাম আমাদের আগরতলা যাবার চুড়ান্ত যাত্রা। গ্রামের লোকেরা যেন দেখতে না পায় আমরা কোন পথে যাচ্ছি সে জন্যেই এই গভীর রাতে রওয়ানা হয়েছিলাম। সকালে সবাই জানবে আমরা ঢাকায় চলে গেছি। প্রভাকরদী থেকে গোপালদী প্রায় ৮-৯ মাইল হবে। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই রাস্তাঘাটে পানি এবং কাদা ছিল। আমরা সেই কাদা পানির মধ্যেই হাঁটছিলাম। কতক্ষণে পৌঁছব কোন ধারনা নেই। হাঁটার গতিও ছিল কম। তবে বিশ্বাস আর মনোবলের কোন অভাব নেই। প্রথম ধাপে প্রায় ৫-৬ মাইল রাস্তা অতিক্রম করি। সবার কাঁধে ব্যাগ। হাঁটতে হাঁটতে যখন খুব ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্ত তখন ছোট একটি চায়ের দোকানে চা নাস্তা খেতে বসি। দোকানের লোকগুলা আমাদের দিকে কেমন করে যেন দেখছিল, এই গ্রামে এত ভোরে শহুরে লোকজন! আমরা খাচ্ছি এমন সময় আবার বৃষ্টি শুরু হলো। চা নাস্তা খেয়ে এই বৃষ্টির মধ্যেই আবার রওয়ানা দিতে হবে। অপেক্ষা করার সময় নাই। তখন চায়ের দোকানদার আমাদেরকে ওর টেবিলের যে প্লাস্টিক কাভারটা ছিল সেটা দিয়ে দিল

যাতে আমরা ভিজে না যাই। গ্রামের সেই চায়ের দোকানদার ধারনা করেছিল যে আমরা আসলে মুক্তি। এখানে জানিয়ে রাখা দরকার যে আমাদের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য কেউ যেন জানতে বা বুঝতে না পারে সেটার দিকে খেয়াল রাখাটা ছিল খুব জরুরী। কারন অনেক জায়গায় তখন রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারলে আমাদের ধরিয়ে দিবে অথবা ধরে নিয়ে মেরে ফেলব। সুতরাং আমাদের চালচলন সাধারণ গ্রামবাসীর মত হতে হবে। কিন্তু বয়স আর চলাফেরা দেখে অনেকেই ধারনা করতে পারত যে এরা মুক্তি। যেহেতু বেশিরভাগ লোকই মুক্তিদের সহায়ক ছিল তাই আমাদের ভয় কিছুটা কম ছিল। গ্রামের সেই চায়ের দোকানের লোকটিও আমাদের মুক্তি ভেবেই সাহায্য করেছিল এবং চায়ের পয়সাও নিতে চাচ্ছিল না। এভাবেই সাধারণ জনগন আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল, তাদের এই ছোট ছোট সাহায্য এক বিশাল অবদান রেখেছিল এই মহান মুক্তিযুদ্ধে। আমরা আজও সেই চায়ের দোকানদারের সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রেখেছি। এরকম অনেক অনেক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধার নয় মাসের জীবনে হয়েছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির মধ্যেই চলতে শুরু করেছি। মুষল ধারে বৃষ্টি। প্লাস্টিক থাকাতে আমাদের ব্যগটা ঢাকতে পেরেছিলাম। হাটতে হাটতে সকাল ১০ টার দিকে আমরা গোপালদী পৌঁছাই। যদিও বৃষ্টি থেমে গেছিল কিন্তু শরীর সম্পুর্ন ভেজা। সেখান থেকে একটি ছোট নৌকা করে এই ঝড়ো বাতাসের মধ্যে মেঘনা নদী পার হয়ে কুমিল্লার অন্তর্গত হোমনা থানায় পৌঁছি। নৌকা থেকে নেমে ভ্যান গাড়ী করে হোমনা সদরে যাই। আনুমানিক ৩ ঘন্টা লেগেছিল নদী পথে। খুব ভয়াভহ ছিল এই নৌকা পথ। ওখানে খোঁজ করে স্থানীয় আওয়ামি লীগ কর্মীদের সাথে মিলিত হই এবং আগরতলা যাবার একটি নিরাপদ রাস্তার সন্ধান চাই। তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের দুপুরের খাবার খাওয়ায় এবং আগরতলা যাবার মোটমুটি নিরাপদ রাস্তা ভাল করে বলে এবং বুঝিয়ে দিল। আসলে কোন রাস্তাই আর নিরাপদ নয়, আজ যেটি নিরাপদ, কাল সেটাই অনিরাপদ। গত কয়েকদিনে তাদের মাধ্যমে অনেকেই ওখান থেকে আগরতলা গেছে। ওখান থেকে রামকৃষ্ণপুর হয়ে কসবা থানার চারগাছ। পুরাটাই নদীপথে যেতে হবে, তবে রামকৃষ্ণপুর থেমে নৌকা বদলাতে হবে এবং ওখানে রাতে থাকতে হতে পারে যদি নৌকা না পাওয়া যায়। তবে রাতে থাকাটা কোন সমস্যা নয়, প্রায় প্রত্যেক বাসাতেই পরিচিত বা অপরিচিত লোকজন রাতে থাকছে এবং সকালে চলে যাচ্ছে। তখনকার ব্যাবস্থাটাই এরকম ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর ওরা আমাদের একটা নৌকাও ঠিক করে দিল পরবর্তি গন্তব্যস্থল কুমিল্লা জেলার রামকৃষ্ণপুর। ওদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সেই নৌকায় রওয়ানা হই দুপুর ৩টার দিকে এবং সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কুমিল্লা জেলার রামকৃষ্ণপুর পৌঁছি। নৌকা থেকে নেমে প্রথম যে বাড়িটি নজরে পরল, সে বাড়িতেই উঠলাম, মানে আশ্রয় চাইলাম। একদম অপরিচিত, কাউকে চিনিনা। বাড়ির যে লোক আমাদের সাথে কথা বলেছিল সে বাইরের ঘরে থাকার অনুমতি দেয়। তখন যারা আগরতলা যেত তারা এভাবেই থেমে থেমে, বিভিন্ন অপরিচিত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েই যেত এবং আমরাও সেরকমই একটি অপরিচিত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাড়ির বৈঠখানায় আমাদের থাকতে দেয়া হলো। রাতে আমাদের ভাত, ডাল আর শবজি পাঠালো, আমরা খেলাম। খাবার জন্য টাকা দিতে চাইলাম, কিন্তু নিলনা। এরকমই ছিল তখনকার নিয়মিত ঘটনা। মুক্তি বাহীনির ছেলে মেয়েদের এভাবেই যেতে হতো এবং গ্রামবাসী সবসময় তাদের সাহায্য সহযোগীতা করত। বাহির ঘরে বিরাট খাট। ওখানে তিনজন আরামে শুয়ে পড়লাম। সাথে সাথে ঘুমিয়েও গেলাম। সারাদিনের ক্লান্তি ও পরিশ্রমে আর জেগে থাকতে পারি নাই।

২৩ শে জুলাই

সকাল ৫ টার দিকে উঠে সামনে মসজিদ সংলগ্ন কলপাড়ে মুখ হাত ধুচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কিভাবে যাবো। একটা নৌকা ঠিক করতে হবে। কোথায় পাবো নৌকার খোঁজ, কাকে বলবো ইত্যাদি চিন্তা মাথায় ঘোরাঘুরি করছে। এমন সময় যে লোকটা রাতে খাবার এনে দিয়েছিল সে জানালো যে বাড়ির মালিক আমাদের সাথে দেখা করতে আসবেন। আমরাও চাচ্ছিলাম ওনাদের সাথে দেখা করে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবো। ভালই হলো উনি নিজ থেকেই আসছেন। একটু পর ভেতর থেকে বাড়িওয়ালি এলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। ওমা, ওনাকে দেখে আমিতো একদম থ! আর আমাকে দেখে উনি অবাক। কারন উনি আমার আপন চাচাত বড় ভাই, ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমান এর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু খান ভাইয়ের স্ত্রী। চিন্তাই করতে পারিনি যে ওনার সাথে এভাবে দেখা হবে। কিছুক্ষন চুপ থেকে ঘোর কেটে উনি বললেন যে তারেক তুমি কিভাবে এলে? কিছুক্ষন কুশলাদি বিনিময়ের পর আমরা বললাম আমাদের আসল উদ্দেশ্য। উনি বললেন যে আমি তোমাদের নৌকা ঠিক করে দিব। তোমরা কোন চিন্তা করোনা। আগে নাস্তা খাও। আমি তোমাদের জন্য নাস্তা নিয়ে আসি। একটু পরে উনি নিজেই পরোটা, গোশত আর ডিম নিয়ে আসলেন এবং নিজে বসে আমাদের খুব আদর করে খাওয়ালেন। তারপর চা। মনে হচ্ছিল নিজের বাসায় খাচ্ছি। এরমধ্যে কিন্তু উনি নৌকার খোঁজ করতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ওনার সাথে অনেক গল্প হোল। সবার খোঁজ খবর নিলেন। ঘন্টা খানেক পর দেখি এক বিশাল গয়না নৌকা ওনার বাড়ির কাছেই নদীর ঘাটে লাগলো। মাঝিকে ডেকে উনি আমাদের সমন্ধে কিছু বলে দিলেন, আর আমাদের বললেন যে তোমরা যাও, এই নৌকা তোমাদের একদম বর্ডারের কাছে নিয়ে যাবে এবং বর্ডারও পার করিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা হবেনা। আরো বলে দিলেন যে কোন টাকা পয়সা দিতে হবেনা। আমাদের শুভ কামনা জানালেন।

আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠলাম। তখন আনুমানিক সকাল ৭ টা হবে। প্রায় ১০০ জনার মত শরণার্থী ওই নৌকায়, সবাই হিন্দু। পরিবার সহ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে এই পাকিস্তানীদের অত্যাচারে। ওখানে ছোট শিশু, মহিলা ও পৌঢ় লোকজন ছিল। ভিতরে কোন জায়গা ছিলনা, তাই আমাদের নৌকার এক মাথায় যেটা নাকি মাঝিদের বসার জায়গা ওখানে বসতে হোল। ওটাও এত বড় যে আমরা তিনজন শুয়ে থাকতে পারি। তবে সারাদিন রোদ, বৃষ্টি ঝড় সহ্য করতে হবে। চারজন মিলে একসাথে চালায় এই বিশাল নৌকাটা। ধীরে ধীরে আমরা চলতে লাগলাম। খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। চারদিকে পানি, দূরে সবুজ ধানক্ষেত আর মাঝে মাঝে সবুজ গ্রাম। চোখ জুড়ানো শোভা এই গ্রাম বাংলার। সকাল গড়িয়ে দুপুর, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা চলছি। সারাদিন কোন খাওয়া জোটে নাই। নৌকাও থামেনি। ধীরে ধীরে বর্ডারের দিকে এগুচ্ছি। খাল, বিল নদীর উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। নৌকার বৈঠার প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দ আর পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনছিলাম আর নৌকার দোলাটা সারাক্ষন অনুভব করছিলাম। নদীর উপর সুর্জাস্ত দেখলাম, কি অপুর্ব দৃশ্য। এত চিন্তা, ভয়, উত্তেজনা তার ভেতরেও এই সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম এবং এখনো তা পরিষ্কার মনে আছে। মাঝে মাঝে বক পাখী উড়ে যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে, গ্রামের মেয়েরা নদীতে কাপড় ধুচ্ছে, আবার কেউ কেউ গোসল করছে, কোথাও আবার কৃষকরা গরু-ছাগলকে গোসল করাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেরা নদীতে ঝাপাঝাপি করছে এরকম অনেক দৃশ্যই চোখে পড়লো। সময় কেটে যাচ্ছে। সকালের নাস্তার পর আর কিছু খাই নাই, এমনকি পানি, সেটাও ছিল না। শুধু কয়েকটা স্টার সিগারেট টেনেছি খালি পেটে। ক্ষূধায় পেট পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু

উপায় নেই। কেউ থামতে দিবেনা, নামতেও দিবেনা। তবে মাঝে এক গ্রামে থামিয়েছিল মহিলাদের প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্য। তখন আমরাও নেমেছিলাম। তখন এক বাড়িতে চেয়ে পানি খেয়েছিলাম। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে চারগাছ বাজারে এসে নৌকা থামালো।

চারগাছ হচ্ছে বর্তমান ব্রাম্মনবাড়িয়া জেলার কসবা থানার অন্তর্গত বর্ডারের একদম কাছের একটি গ্রাম, এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা তখন এ চারগাছ দিয়েই আগরতলা যেত। ওখান থেকে বর্ডার একদম কাছে। এখানে এসে আবার গুলি ও মর্টারের আওয়াজ পেতে শুরু করলাম। এখন কেউ নামতে পারবেনা। মাঝি জানাল নৌকা যাত্রা এখানেই শেষ। এরপর পায়ে হেঁটে সীমানা পার হতে হবে। একটু সামনেই সি এন্ড বি রোড, তারপর একটি ছোট খাল এবং এরপর বাংলাদেশ রেল লাইন। এই রেল লাইন পার হলেই আগরতলা। কখন পার হব এইটা নির্ভর করবে স্থানীয় যে পথ নির্দেশক তার উপর। তবে সম্ভবত শেষ রাতের দিকে হয়ত আমাদের বর্ডার ক্রস করতে হবে। সুতরাং ততক্ষন পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে নৌকায় চুপ করে বসে থাকতে হবে সবাইকে। মাঝি বলল সামনেই সিএন্ডবির রাস্তা, ওখানে মাঝে মাঝে পাক আর্মির গাড়ী পেট্রল দিচ্ছে, গাড়ীর লাইট দেখে বোঝা যায়। আধা মাইলের কিছু বেশী দূরত্ব হবে এই রাস্তার। মাঝি আরো বলল যে পাক আর্মিরা নাইট টেলেস্কোপ দিয়ে দেখে। এত লোক একসাথে দেখলে সন্দেহ করবে এবং গুলিও করতে পারে। তাই নৌকার ভিতর চুপ করে বসে থাকাটাই হচ্ছে এখন সবথেকে নিরাপদ। আমরাও তাই করছি। বাজার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। কিছু কিনে খাওয়ারও উপায় নেই। ক্ষীদায় আমাদের জান যায়, কিন্তু খাবার নেই। ওদিকে নৌকার অন্যান্য যাত্রিরা অনেক খাবার নিয়ে উঠেছে। তারা দিনভরই খাওয়া দাওয়া করেছে। আমরা একদম খালি পেট। সকালের নাস্তাটুকুই সব। সিগারেটই আমাদের একমাত্র খাবার, কিন্তু সিগারেটও আর ভাল লাগছে না এখন, তীতা লাগছে। পেট জ্বলছে। মাঝিরা সবাই নেমে গিয়েছিল আমাদের বসিয়ে। ঘন্টা দুয়েক পর এসে সবাইকে ডাকলো। বললো একজন একজন করে নেমে লাইন করে নীরবে ওদের সাথে যেতে। রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাই নামলেও আমরা বসেই ছিলাম। পরে একজন মাঝি এসে আমাদের নিয়ে গেল একটি স্কুলঘরে। একটা বড় ঘর, সে ঘরের মাটিতে লম্বা করে পাটি বিছিয়ে সবাইকে বসিয়েছে, তার উপর দস্তরখান আর এক প্রান্তে জায়গা করে দিয়েছে আমাদের বসার জন্য। হারিকেন ও কুপি জ্বালিয়ে অল্প আলোর ব্যবস্থা করেছে। সবার সামনে টিনের বাসন, কয়েকজনার জন্য একবাটি লবন আর একটি ছোট বাসনে পিয়াজ আর কাঁচা মরিচ। সাথে প্লাস্টিকের জগে পানি আর টিনের গ্লাস, কয়েকজনের জন্য একটা গ্লাস। আমাদের তিনজনার জন্য আলাদা। একটু পর আসল ভাত, ডাল আর শবজী, সাথে কাঁচা মরিচ ও কাটা পেয়াজ, সবই গরম এবং টাটকা। ভাত থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। সে কি সুঘ্রান ওই ভাতের, এখনো নাকে লেগে আছে। কয়েকজন লোক মিলে বেড়ে বেড়ে সবাইকে খাওয়াল। গোগ্রাসে খেলাম, প্রচুর ক্ষিদা ছিল, অনেক খেলাম। ভীষন মজা লাগল খাবারটা। আমার জীবনে এত মজার খাবার, অথবা খাবার খেয়ে এত মজা আর কখনো পেয়েছি কিনা মনে নেই। দেশ-বিদেশে অনেক উচুমানের রেস্টুরেন্ট, হোটেলে খেয়েছি, কিন্তু মাঝির ঐ খাবারের স্বাদ এখনো জিবে লেগে আছে।

খাবার শেষ হবার পর মাঝি সবার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে আসে নি। আমরা নিজে থেকে যখন পয়সার কথা বললাম সে জিভ কামড়ে বলে (*এইডা কি কইলেন বাবা। আমনেগ লাইগ্যা তো কিসুই করতাম*

পারলামনা। আমনেরা আমাগ লাইগ্যা জীবন বাজী ধরসেন, আর আমাগো এই হুগনা ডাইল ভাতের পয়সা নিতে কন। নাগো বাজান মনে কিসু নিয়েননা। গরিব মানু আমরা। পারলে অনেক কিসু খাওয়াইতাম)। অথচ সে চাইলে ঐ খাবারের দশগুন টাকাও নিতে পারত।

মাঝির কথা শুনে একদম চুপ হয়ে গেলাম। আমাদের চোখে পানি চলে এল। এত ভালবাসা আশা করিনি। দেশে এত সরল মনের মানুষ যে আছে, শহরে থেকে আমরা এটা ভুলেই গেছি। আমরা আর কিছুই বলতে পারলাম না। বুঝলাম যে সাধারন গ্রামবাসী আমাদের কত ভালোবাসে, তারাও জীবন বাজী রেখে নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করে এই মুক্তিদের সাহায্য করছে, তারাও স্বাধীনতা চায়। তাই এত আদর আর এত ভালোবাসা। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর এবার প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার নৌকায় আগের জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসলাম। ভাবতে থাকলাম আমাদের লোকগুলা কত নিরীহ, কত সরল আর কত আবেগ প্রবন। এর মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি, মাঝে মাঝে সিগারেট টানছি, কিন্তু ঘুমাইনি। নৌকার দোলাটা এখনও অনুভব করছি। মনে হয় নৌকা এখনও চলছে আর দুলছে। রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে মাঝি নৌকাটাকে নিয়ে চারগাছ বাজারের উল্টা দিকে, নদীর অপর প্রান্তে নোঙর করলো। বাজারটা ছিল হাতের ডানে, এখন আমরা বা দিকে মানে অপর পারে অবস্থান নিয়েছি। ওখানে নামতে হবে সবাইকে এবং হেঁটে বর্ডার পার হতে হবে।

কিছুক্ষন পর মাঝি এসে বলল যে রাস্তা পার করার লোক এসে গেছে, আপনারা একজন করে রেডি হয়ে নামেন, মানে মালপত্র, ব্যাগ এসব নিয়ে নামেন এবং এক লাইন করে দাঁড়ান। এখন পার হতে হবে। রাস্তায় এখন আর্মির পেট্রোল শিথিল করা হয়েছে। এখনই পার হবার সবচেয়ে ভাল সময়।। আমরা একে একে নামলাম। সামনেই সিএন্ডবি রাস্তা দেখা যাচ্ছে। পায়ে হাঁটার একটি সরু মাটির রাস্তা আছে আর তার পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে ধান ক্ষেত। এই ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়েই গিয়ে রাস্তায় উঠতে হবে, যদি কোন সংকেত আসে তাহলে একদম শুয়ে পরতে হবে। একজন একজন করে পার হতে হবে এবং খুবই সাবধানে, কোন আওয়াজ করা চলবেনা। একজন গাইড আমাদের পার করিয়ে দেবার জন্য ঠিক করা আছে। দেখলাম সামনে পায়জামা পাঞ্জাবি পড়া দাড়িওয়ালা এক লোক ছাতা নিয়ে অপেক্ষা করছে। জানলাম উনি লোকাল শান্তি বাহিনীর লোক, কিন্তু কাজ করেন মুক্তি বাহীনির জন্য। উনি রাস্তার উপর গিয়ে যদি ছাতা উপরে করেন তাহলে আমরা থামবো এবং ধানক্ষেতে একদম শুয়ে পরবো, আর ছাতা নামিয়ে ফেললে আমরা দৌড়াবো রাস্তার দিকে। এই ছিল আমাদের প্রতি নির্দেষ। রাস্তা পার হলেই একটা খাল পরবে, ওটা পার হয়েই ট্রেন লাইন আসবে। সেই লাইনের অপর প্রান্তেই হচ্ছে আগরতলা। এত কাছে তবুও বহুদুর! অনেকেই এ রাস্তা পার হতে গিয়ে মারা গেছে। অনেকে পার হতে গিয়ে এ রাস্তার উপর, অনেকে পানিতে নামার পর, আবার অনেকে ট্রেন লাইনে ওঠার পর গুলি খেয়েছে। মৃত্যু প্রতি মূহুর্তে এটা জেনেও এ ঝুঁকি নিয়েই পার হচ্ছে সবাই। এ ছাড়া আর বিকল্প ভাল কোন পথ নেই। এই পথটুকুই সবথেকে ভয়ের ও বিপদসংকুল পথ। আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলাম। ভীষন ভয় হচ্ছে, বুক দুরু দুরু করছে, জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। পার হতে হয়ত ১৫-২০ মিনিটের মত লাগবে। কিন্তু মনে হচ্ছে বহু সময় পেরিয়ে গেছে তবুও আমরা পার হতে পারছিনা। ১৫-২০ মিনিট তখন ১৫-২০ ঘন্টার মত লাগছিল। অনেক ভয় আর দুরু দুরু বুকে এগুচ্ছি। কখনো শুয়ে পরছি আবার কখন দৌড়ে এগুচ্ছি। মাথা কাজ করছেনা, চিন্তাশক্তি লোপ

পেয়েছে। শুধু দৌড়, মাটিতে শোয়া, দাঁড়ানো আবার দৌড়ান এই কাজ করছি। এভাবে খুব সাবধানে এবং দ্রুত গতিতে একসময় দেখি আমি সিএন্ডবি রাস্তায় দাড়িয়ে আছি। খুশিতে চিৎকার দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু না, এখনো বিপদ্মুক্ত নই, এরপর একটি খাল, বেশি চওড়া নয়, ১০-২০ ফিটের মত হবে কিন্তু দীর্ঘ। মানে পানিতে নেমেই পার হতে হবে। দৌড়ে ওটাতে নামলাম। শুনেছিলাম হাটু অথবা কোমর পানি হবে। কিন্তু নেমে দেখি গলা পর্যন্ত পানি, জান পরান দিয়ে কিছুটা সাঁতরিয়ে, কিছুটা হেঁটে খাল পার হয়ে দেখি আর একটু সামনেই রেইল লাইন, এক দৌঁড় দিয়ে রেল লাইনে উঠলাম, উঠে মাথা ঘুড়িয়ে আবার একঝলক বাংলাদেশ দেখলাম, এটাই আমাদের শেষ সীমানা। তারপর আবার দ্রুত নেমে পরলাম, এরপর এক দৌড়ে ভারতীয় সীমানায় গিয়ে উঠলাম। দেখি ভারতীয় পতাকা এবং বিএসএফ। বুঝলাম ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করেছি, আহ কি শান্তি! লম্বা শ্বাস ফেললাম। আমরা বর্ডার পার হতে পেরেছি, বিরাট একটা কাজ করেছি, এখনো হাপাচ্ছি। কিন্তু আর ভয় নেই, পাক আর্মি আর আমাদের ধরতে পারবে না। আমরা এখন আগরতলায় এসে গেছি। তখন মনে হয় সকাল ৬-৭ টা বাজে। আমরা এখন নিরাপদ। হঠাৎ খেয়াল করলাম যে আমার কাঁধের ব্যাগটা ও পকেটে যে সিগারেট ছিল তা সম্পুর্ন ভিজে গেছে, এতক্ষন এসব কিছুই বুঝিনি বা খেয়াল করিনি। জীবনের মায়া যে কত বড় এটাই তার প্রমান। যাই হোক এই ভেজা ব্যাগ আর সিগারেট নিয়েই হাটছি। একটু এগুতেই ভারতীয় সেনা, মানে বিএসএফ আমাদের থামালো। ওরা আমাদের অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানালো, সাহস দিল, তারপর শহরে কি ভাবে যেতে হবে বুঝিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। ঐ এলাকাটা ছিল একটু উচু নিচু, অনেক গাছ পালাও ছিল, মনে হচ্ছিল বনে ঢুকেছি। অনেক পাখির ডাক শুনছিলাম আবার সে সাথে পাক আর্মির গুলির আওয়াজও কানে আসছিল। আরো কিছুদুর যেতেই দেখলাম বাংলাদেশি অভ্যর্থনা কেন্দ্র, বাংলাদেশী পতাকা উড়িয়ে বীরের মত কিছু লোক চেয়ার টেবিল নিয়ে নতুনদের অভ্যর্থনা জানাতে বসে আছে। ওরা আমাদের সাথে কিছু কথা বলে, ঢাকার এবং দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাইল, তারপর আমাদের শহরে যাবার রাস্তা এবং হাফানিয়া ক্যাম্পের ঠিকানা বলে বিদায় দিল। বলে দিল প্রায় ৮-১০ মাইল রাস্তা হবে, তবে হেটে যাওয়াই ভাল। আমরাও এই নির্দেশনা নিয়ে শহরের দিকে পায়ে হেটে অগ্রসর হতে থাকলাম।

.....

সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

৩য় পর্ব

১৯৭১

হাফানিয়া ও গকুলনগর।

২০ জুলাই

বর্ডার থেকে আগরতলা শহরে যেতে প্রায় ৩ ঘন্টা লেগে গেল। আমরা পায়ে হেটে চলছি। তখন ১১টার মত বাজে। আমরা প্রচন্ড ক্ষুধার্ত। তাই কিছু খেতে একটি মোটামুটি ভাল খাবার দোকানে যাই, অনেক ক্ষিধা। কিন্তু দোকানের লোক গুলা আমাদের খেতে দিল না, আমরা মুসলমান, তারা বলল এরা শেখ এই বলে আমাদেরকে দোকান থেকে বের করে দিলো। প্রথম অভিজ্ঞতা খুব বাজে হলো। পরে একটি ছোট দোকানে গিয়ে সামান্য কিছু খাই। ওখানে তখন পাকিস্তানী টাকা চলত আধা দাম দিত।

যাই হোক কিছু খেয়ে ভাবছি কোথায় গেলে সবচেয়ে ভাল হয়। তখন মনে হল আমার কলেজ বন্ধু জালালের কথা, মানে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, শুনেছিলাম ও নেতাদের সাথে থাকে, কলেজ টিলায় ওদের বাসা। ভাবলাম ওখানে গেলে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। সেই মত বিভিন্ন লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আমরা পৌঁছাই কলেজ টিলায় অবস্তিত কংগ্রেস ভবনে। ওখানে থাকতেন আমাদের চার নেতা। জনাব নুরে আলম সিদ্দকি, আবদুল কুদ্দুস মাখন, জনাব আসম আবদুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ। মাখন ভাই এর ছোট ভাই আমার মেডিকেলের বন্ধু। সেটাকেও যদি কাজে লাগানো যায়, মানে ট্রেনিংটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। কিন্তু ওখানেও কারও দেখা পেলামনা। যারা ছিল তারা আমাদের সাহায্য করার মত কেউ না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হলো শরিফের ফৌজডারহাট কেডেট কলেজের আর্টের শিক্ষক আজিজ স্যারের সাথে। উনি নিয়ে গেলেন কাছেই অবস্তিত জয় বাংলা অফিসে। কিছুক্ষন গল্প করলাম, উনি চা খাওয়ালেন। তারপর আমরা ফিরে এলাম আবার কংগ্রেস ভবনে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভাবলাম রাতটা যদি এখানে কাটানো যায় তাহলে সকালের মধ্যে হয়ত ওনাদের দেখা পেতে পারি। কিন্তু রাতে থাকবো কোথায়। তখন ওখানকার কর্মচারি ছেলে গুলা বলল ভেতরে কোন জায়গা নেই, ইচ্ছা করলে বারান্দায় শুতে পারেন। কি আর করা। বারান্দায়ই শুতে হবে। লাল মেঝে। কিন্তু চকচকে ও পরিষ্কার। আমার আবার সেদিনই চোখ উঠেছে মানে ভাইরাল কনজাংন্টিভাইটিস হয়েছে। লাল টকটকে চোখ, আলোর দিকে তাকাতে একদম পারছিলামনা। চোখে অনেক ব্যাথা, পেটে প্রচন্ড ক্ষিধা। কোথায় খাবার পেতে পারি জিজ্ঞেস করতে বলল এখানে কাছাকাছি কোন খাবার দোকান নেই। পরে ওরা আমাদের বাতাসা আর শুকনা চিড়া এনে দিল। তাই খেয়ে ক্ষিধা মেটালাম। এবার ভেজা ব্যাগটা মাথার নিচে রেখে গামছা দিয়ে চোখ বেধে শুয়ে পরলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম। খুব সকালে ঘুম ভাঙলো। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম যদি কাউকে পাই, কিন্তু কেউই আসেনি। এখানে আর কিছু না খেয়ে ৯ টার দিকে আমারা রওয়ানা দিলাম হাফানিয়া ক্যাম্পের উদ্দেশে। ৮-৯ মাইল দুর। পয়সা বাচানোর জন্য আমরা হেটেই যাবো ঠিক করলাম। বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে হাফানিয়া পৌছালাম দুপুর ১ টার দিকে। পথে একটু চা বিস্কুট খেয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের নাম

রেজিস্ট্রেশন করে তাবু পেতে পেতে দুপুর ৩টা। তাবুটাই সব, নিচে শক্ত অসমান মাটি। ওখানে ৩ জন আগে থেকেই ছিল। আমি আর শরীফ নতুন যোগ দিলাম। ৫ জন চিত হয়ে শোয়া যাবেনা, দু একজনকে কাত হয়ে থাকতে হবে। আমরা গামছা বিছিয়ে আর ব্যাগটা বালিশ বানিয়ে শোবার চিন্তা করলাম। কিন্তু বড্ড ক্ষিদা লেগেছে, ওখানে কর্মরত একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কখন খাবার পাবো। বলল ৪ টায় খাবার দিবে। অপেক্ষায় থাকলাম, কিন্তু ৪টার সময় বলল আমরা দুপুরের খাবার পাবোনা। আমাদের রাত থেকে খাবার দেয়া হবে। সারাদিন খাইনি, সেই গতকাল দুপুরের দিকে কিছু খেয়েছিলাম, এরপর চা, বিস্কুট বাতাসা ছাড়া আর কিছু পেটে পরে নি। আবার চোখে ইনফেকশন, ব্যথা করছে, চুলকাচ্ছে, প্রচন্ড ক্ষীদা, পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু খাওয়া নাই। কি আর করা। কিছু করার নেই, অপেক্ষা করতেই হবে। গেঞ্জি দিয়ে চোখ বেধে শুয়ে থাকলা। অবশেষ সন্ধ্যা ৭ টায় খাবার ডাক আসল। মাঠে লাইন দিয়ে বসলাম। প্রথমে দুজন লোক সবাইকে একটি করে টিনের সাদা বাসন দিল এরপর এক ঝুরি গরম ভাত নিয়ে দুজন হাটছে, আর একজন সবার প্লেটে বেড়ে বেড়ে দিচ্ছে, একই ভাবে আরও কিছু লোক ডাল আর শবজি দিয়ে গেল সবার প্লেটে। আর একজন সবাইকে লবন ও মরিচ দিয়ে যাচ্ছে। ভাত, ডাল আর শবজি সবই গরম, মানে মাত্রই রান্না হয়েছে। কিন্তু খাবার মানটা ছিল খুবই নিম্নমানের। ডালটা পানিই বলা যায়, মানে ৩০ লিটার পানিতে ১/২ কেজি ডাল হয়ত দিয়েছে, ভাতে ১/৪ কংকর আর ১/৪ পোঁকা আর শবজি, মানে আলু, পেপে আর গাজর, তাও আবার আধা সেদ্ধ। পেটে এত ক্ষিধা, হাত মুখ না ধুয়েই খেতে বসেছিলাম আর এই খাবারগুলাই পেট ভরে খেলাম। খাবার পর পানি চাইলাম, বলল যার যার পানি সে যোগার করে নিবে। এখন পানি কোথায় পাই। আমাদের কোন পানি নাই, পানি কোথা থেকে জোগার করবো, কিসে রাখবো, কিছুইত নেই। তখন একজন তার বোতল থেকে একটু পানি দিল খেতে। খাবার পর আবার প্লেট ধুয়ে এনে জমা দিতে হবে। তাই ধুতে গেলাম, কিন্তু কোন কল নাই, পানি কোথায় পাবো জানিনা, একটু হেটে সামনে গেলাম, দেখলাম একটি ডোবার মত, কিছু পানি জমে আছে তাতে। ওখানেই হাত আর প্লেট ধুয়ে এনে জমা দিলাম। এরপর আমাদের লাইন করে দাড় করিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ান হোল। তারপর ঘুমাতে গেলাম। আমি আর শরিফ এক তাবুতে, নশু অন্য তাবুতে। একটি তাবুতে ৫ জন। আমার তাবুর অন্য তিন জনের একজন কসাই, ঢাকার লোক আর বাকি দুজন গ্রামের কৃষক, কুমিল্লা থেকে এসেছে। ঘুম আসতে দেরি হলো কারন ৫ জনের শুতে কষ্ট হচ্ছিল, গরম আর চারদিকে অনেক আওয়াজ। তাছাড়া আমি কোনদিন এরকম মাটির উপর শুইনি। অনেক ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু ঘুম ভাল হলোনা। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গেলাম। তাড়াতাড়ি গেলাম ওই ডোবাটার কাছে যাতে ভিড় হবার আগেই মুখ ধুয়ে আসতে পারি। কিন্তু গিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া! ওখানে মানুষ গোল হয়ে দাড়িয়ে প্রস্রাব করছে। আর ওই পানি দিয়েই কিনা কাল রাতে হাতমুখ আর প্লেট ধুয়েছিলাম? মুখ না ধুয়েই ফিরে এলাম। ভাবলাম এ কোথায় এলাম। সকালে আবার আমাদের দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ান হোল। এরপর একটা লেকচার শুনতে হলো। পরে আমরা তিনজন একটু এলাকা ঘুরতে এবং দোকানপাট কোথায় আছে খোঁজ করতে বের হই। প্রায় আধা মাইল দূরে একটা ছোট দোকান পেলাম যেখানে মুড়ি, পাউরুটি আর ডালচানা পাওয়া যায়। একটা রুটি কিনলাম, দাম আট আনা আর চানাডাল কিনলাম আটা আনার। আমরা তিনজন খুব মজা করে খেলাম এই খাবার। দুটা প্লাস্টিকের খালি বোতল কিনলাম, পানি রাখার জন্য। পাঁচ দিন হাফানিয়াতে ছিলাম, প্রতিদিন সকালে এ দোকানে এসে একই খাবার খেতাম, এটিই ছিল আমাদের নাস্তা। এরই মধ্যে একদিন বিকালে ক্যাম্পে হাটছি, হঠাৎ আমার কলেজের বন্ধু (জালাল) মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন (প্রাক্তন এমপি) এবং তখনকার ছাত্রলীগ নেতা,

ওর সাথে দেখা। খুবই খুশী লাগল। ও আমার এবং সবার খোঁজখবর নিল, বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম। পরে ও চলে গেল। আমরা রয়ে গেলাম। হাফানিয়াটা আসলে একটি শরণার্থী ক্যাম্প। এটার আসল নাম ছিল হাফানিয়া ইউথ ক্যাম্প। এখানে মোটেই ভাল লাগছিলনা। আমরা চাই আর্মস ট্রেনিং। গান গেয়ে আর বক্তৃতা শুনে কি হবে। যাই হোক। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ৪-৫ দিনের মাথায় খবর আসলো যারা মুক্তিযুদ্ধে যেতে চায় তারা ট্রেনিং ক্যাম্পে যাবার প্রস্তুতি নিতে। অতি খুশী হলাম। রেডি হয়ে গেলাম সাথে সাথে। আমাদের নামের একটা লিস্ট বানিয়ে একজন দায়ীত্বশিল লোকের হাতে দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিল আগরতলা শহরের অদুরে অবস্থিত গকুল নগর ক্যাম্পে। হাফানিয়া থেকে ৮-১০ মাইল দূরে এই গকুল নগর। আমরা হেঁটে হেঁটে আসলাম। অনেকটা গ্রামের মত, আসলে এটি একটি জংগল। আসে পাশে কিছু গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম আসার সময়। আমরা এই জংগলটাকে পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে থাকার উপযুক্ত করে তুলি। ওখানে যাবার পর প্রথমে আমাদের ব্যাগ এবং বডি চেক করে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়। ঢুকেই তাবু খাটানোর কাজে নামল একদল আমাদের ছিল রান্নাবান্নার দায়ীত্ব। ওখানে আগে থেকে কিছু লোক ছিল, তারা সবাই অফিস ডিউটি করত। ওরা বাজার করে রেখেছিল আগে থেকেই। প্রথম দিন দুপুরের খাবার খেতে বিকাল চারটা বেজে যায়।
ওই ক্যাম্পে আমাদের ফিটনেস আর পিটি প্যারেড করানো হত। তাছাড়া রান্না করা, জ্বালানী সংগ্রহ ও জংগল পরিষ্কার করা, গন সৌচাগার তৈরি, কুপ খনন ইত্যাদি কাজ করতে হোত। মাঝে মাঝে সাইকোলজিকাল ও মোটিভেসননাল ক্লাশ হোত। মানে মনোবল বৃদ্ধি ও চাংগা রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানাদি হোত। নশু খুব ভালো রুটি বানাত। থালের উল্টাদিকে বাশ দিয়ে রুটি বেলতো এবং সেটা সুন্দর গোল হোত। সবাই খুব পছন্দ করতো। ক্যাম্প নিরপত্তার জন্য আমরা ২৪ ঘন্টা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করতাম। একদিন নশু এই দায়িত্ব পালনের সময় ভোর রাতে এক লোক ক্যাম্পে ঢুকতে চাইল, কিন্তু পাসওয়ার্ড বলতে না পারার কারনে ওনাকে ঢুকতে দিলনা। উনি ফিরে গেলেন। পরে নশু জানতে পারে যে উনি আমাদের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মান সিং ছিলেন। নশুত ভয়ে অস্থির, যে আজকেই ক্যাম্প থেকে ওর বিদায় নিতে হবে। সকালে যথারীতি মান সিং ক্যাম্পে এলেন এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য ওকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রশংসা করলেন।

ওই ক্যাম্পে আমরা ১৩০০ এর মত ছিলাম। হাফানিয়ার থেকে অনেক ভালো ছিল এই ক্যাম্প। থাকার জন্য বড় বড় তাবু ছিল, তাতে দশ জন ভাল মত শোয়া যেত। খাওয়ার মান ভাল ছিল, বিশাল মাঠ ছিল। আলফা, ডেলটা ও চার্লি নামে তিনটা উইংএ আমাদের ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটা উইংকে কাজ ভাগ করে দেয়া হতো, কাউকে রান্না, কারো জংগল সাফ করা, কাঠ জোগার করা ইত্যাদি। সব থেকে কষ্টের ছিল পানি আনা, সেই ৫০০ গজ দূর থেকে প্রায় ১০০ সিড়ি নিচে নেমে পানি সংগ্রহ করে রান্না করতে হতো। পরে অবশ্য আমরা নিজেরাই কুপ ক্ষনন করি এবং পানির অভাব মিটাই।

অনেক বন্ধু পেয়েছিলাম এখানে এসে। এখানকার সবাই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করতেই এসেছে। সেটাও ভাল লাগত। বড় ছোট মিলিয়ে অনেকের সাথেই বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেকের নাম মনে নেই। তবে ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ভুলি নাই, যেমন মোশাররফ হোসেন রতন, কেডেট কলেজের ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র, ও আবার ছিল কোম্পানি কমান্ডার। সামসুজ্জামান তৈমুর তখন কলেজ ছাত্র, এখন অস্ট্রেলিয়াতে। নুরুল হক খান বাবুল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র। কবির ইঞ্জিনীয়ারিং এর ছাত্র। মোকাররাম ভাই, আবু তাহের, আব্দুল্লাহেল হেলাল (আব্দুল্লাহ আবু সাঈদের ছোট ভাই) বর্তমানে নিউইওর্কে আছে। স্বপন কুমার ভৌমিক দারুন গান গাইত। মঞ্জুর সেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, দেশে আসার অল্প কিছুদিন পর পাক আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়। শাজাহান ভাই, উনি ছিলেন তিনটা কোম্পানির কমান্ডার এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশের ইনকাম ট্যাকস কমিশনার ছিলেন। শান্ত (ইমামুল কবির শান্ত), শান্ত মরিয়ম ফাউন্ডেশনের প্রতষ্ঠাতা ও মালিক। আরো অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়, এখন আর তাদের নাম মনে নেই। আমিই একমাত্র মেডিকেলের ছাত্র, আমাকে ডাকত ডাক্তার বলে। আমি, নশু আর শরিফ মাঝে মাঝে বিকালের দিকে হাটতে যেতাম আসেপাশের গ্রামের দিকে। একদিন সিগারেট খেতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু পয়সা নেই, তাই এক স্থানীয় লোককে বললাম একটা সিগারেট দিতে, উনি বয়সে বড়, একটু তাকিয়ে আমাদের দুটা সিগারেট দিয়ে দিলেন। আমরাতো মহাখুশী। এরকম আরও অনেক ঘটনাই ঘটেছে এই মুক্তিযুদ্ধের সময়।

অবসর সময় আমরা হাটতে যেতাম, বসে সুখ দুক্ষের গল্প করতাম, কিভাবে কোন পথে আসলাম আগরতলা, দেশের বাড়ি কোন জেলায়, কি করি বা পড়ি, দেশে কে কে আছে, মা বাবা, ভাই বোনদের গল্প, ইত্যাদি। এগুলা করে মনকে হালকা রাখতাম। তারপরও দেশের জন্য, সবার জন্য প্রায়ই মন খারাপ হোত। সবাই কেমন আছে, পাক আর্মি কি আবার কাউকে ধরে নিয়ে গেল কিনা, কাউকে কি মেরে ফেললো কিনা ইত্যাদি চিন্তা সারাক্ষণ মাথায় ঘুরত। বিশেষ করে আম্মার কথা প্রতি মূহুর্তেই মনে হোত। কখনো একাকি কাঁদতাম, খারাপ লাগত। কিন্তু সময় থেমে থাকেনি, ঘড়ির কাঁটা চলছিল তার নিয়মে। ধীরে ধীরে খাপ খাওয়াচ্ছিলাম এই পরিবেশে। কিন্ত এই আরামও আর ভাল লাগছিল না, কারন বারুদের গন্ধ পাচ্ছিলামনা, কোন আর্মস দেখছিলাম না। সেটাই আমাদের দুঃক্ষ। কিছু করারও নেই।
এই ক্যাম্পের দায়ীত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন (অব:) মাণ সিং। উনি গুরখা রেজিমেন্টের সদস্য ছিলেন। গম্ভীর, শান্ত মেজাজের লোক। আমাদের সাথে মাঝে মাঝেই গল্প করতেন। আমাদেরও ভালো লাগত। তবে আমরা সবাই বন্দুক বা আর্মস ট্রেনিংএর জন্য মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম। প্রায় একমাস একই কাজ করছি। যুদ্ধ করার কিছু শিখছিনা। অস্থির লাগছিলো।

এমন সময় একদিন সকালে নিয়মিত পিটি প্যারেড শেষে ক্যাপ্টেন মান সিং আমাদের সুখবর দিলেন। বললেন আমাদের আর্মস ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা হয়েছে, যেতে হবে আসামের শিলচর। আর আমাদের যাত্রা আজ রাতেই হবে। দিনটা ছিল আগস্ট মাসের ৩১ তারিখ। এখবর শুনে আমাদের খুশির অন্ত নেই। আজ রাতেই যাবো। উহ ভাবতেই পারছিলামনা। আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দয়ে এবং শুভকামনা জানিয়ে মান সিং বিদায় নিলেন, কিন্তু সন্ধ্যায়আবার আসবেন সেটাও বলে গেলেন। সর্বমোট ১১০০ জনকে নিয়ে যাবে আসামের শিলচরে অবস্থিত লায়লাপুর ক্যান্টনমেন্টে। প্রায় ২৪ ঘন্টা লাগবে রাস্তায়। আমাদের আনন্দের শেষ নেই, তার উপর সবাই একই সাথে যাচ্ছি। এসেই ব্যাগ গুছিয়ে রেডি। মানে বলবে আর গাড়িতে উঠবো।

সেই সকাল থেকেই অপেক্ষা করছি যাবার জন্য। অবশেষে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে দেখি একে একে ২০ টি ট্রাক ঢুকলো আমাদের ক্যাম্পে। আমরা বিকালে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম, যাতে শেষ মূহুর্তে খেতে গিয়ে আবার

যাওয়া মিস না হয়। রাত ৮ টার দিকে নাম ডেকে ডেকে ৫৫ জন করে প্রতি ট্রাকে ওঠান হোল। অনেকটা কোরবানির গরুর মত ঠাসাঠাসি করে ট্রাকে যায়গা করে নিলাম। আমি, নশু, শরীফ এক ট্রাকেই উঠলাম। কিছু চিড়া, রুটি আর কলা কিনে নিয়েছিলাম রাস্তায় খাবার জন্য। ক্যপ্টেন মান সিং প্রতি ট্রাকে এসে এসে আমাদের যাত্রা যেন শুভ হয়, আমরা আমাদের লক্ষ্যে যেন সফল হই এই শুভ কামনা জানিয়ে আমাদের সবার ভালবাসা নিয়ে বিদায় নিলেন।

রাত ১০ টায় লাইন দিয়ে ট্রাকগুলি একসাথে ছুটল। সাথে একটা জীপে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন আমাদের গাইড হিসাবে যাচ্ছেন। একমাসের পুরান এই গকুলনগর ছেড়ে যেতে খারাপই লাগছিল। কিন্ত যে কাজে এসেছি সেটার জন্যে যাচ্ছি, তাই আননন্দেরও কমতি ছিলনা। ছুটে চললাম। আকাবাকা পাহাড়ি পথ দিয়ে, যদিও রাত, কিন্তু ট্রাকের লাইটে দেখা যাচ্ছিল আসেপাশের চিত্র। কোথাও দুপাশে পাহাড়, আবার কোথাও এক পাশে পাহাড় আর অন্যপাশে গভীর খাদ। বেশ ভয়ই লাগছিল। ভিষন আকাবাকা রাস্তা, আর আমরা ক্রমশ উপরে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে একদম কিছুই দেখা যায়না, মেঘ আমাদের গা ভিজিয়ে চলে যায়। এর মাঝে একপসলা বৃষ্টিও হয়ে গেল, ভিজলাম সবাই। কিন্তু ট্রাক থেমে নেই, আমরা চলছি। রাত ১টায় আমরা এসে থামলাম তেলিয়ামোরা নামে একটি জায়গায়, কিছু প্রাকৃতিক কর্ম সেড়ে আবার ছুটলাম। প্রায় ৩টার দিকে এসে থামলাম ধর্মনগর। একটি বাজারের কাছে। ওখানে আমরা কিছু খাওয়াদাওয়া করে সকাল ৬টায় আবার রওয়ানা হয়ে রাত ৮ টায় আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল, আসামের শিলচরে অবস্থিত লায়লাপুর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছালাম। ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ইন্ডিয়ান আর্মির মেজর মালিক রানা, ক্যাপ্টেন রবিন্দ্র সিং, ক্যাপ্টেন সুশিল, ক্যাপ্টেন রাউত, ক্যাপ্টেন ডিপক চাড্ডা এবং কিছু জেসিও এবং অনেক সেপাই।

.....

সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

৪থ পর্ব

১৯৭১

লায়লাপুর ক্যান্টনমেন্ট।

শিলচর, আসাম

১লা সেপটেম্বর

১লা সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় আমরা আগরতলা থেকে আসামের শিলচর শহরের লায়লাপুর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। ট্রাক থেকে নেমে দেখি ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন অনেক সেনা বাহিনীর লোকজন। কয়েক জন অফিসারের নাম মনে করতে পারছি। যেমন মেজর মালিক রানা, ক্যাপটেন রবিন্দ্র সিং, ক্যাপটেন সুশিল, ক্যাপটেন রাওয়াত, ক্যাপ্টেন ডিপক চাডা, কিছু জেসিও এবং আরও অনেক সেপাই। ওনারা সবাই দাড়িয়ে আছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই ওনারা দাড়িয়ে ছিলেন আর আমরা একে একে নামলাম ট্রাক থেকে। একটা বিরাট প্যারেড গ্রাউন্ডে আমাদের লাইন করে দাড় করান হলো। অফিসারবৃন্দ এসে সামনে দাড়ালেন। এ ক্যাম্পের দায়ীত্ব প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন মেজর মালিক রানা। উনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আসা, এত বড় একটা ঝুঁকি নেয়া এবং দেশের প্রতি যে আমাদের প্রচন্ড ভালবাসা তার ভুয়সী প্রশংশা করলেন। আমাদের ট্রেনিং যেন খুব ভাল হয় এবং যে কোন অসুবিধায় যেন আমরা তাদের জানাতে ভুল অথবা ভয় না করি এই বলে এবং দেশ ও সবার শুভ কামনা করে উনি বক্তব্য শেষ করলেন। আমাদের খুব ভাল লাগল তার এ বক্তৃতা। মনটা জুড়িয়ে গেল।

এখানেই হবে আমাদের ট্রেনিং আগামী তিন সপ্তাহ। এলাকাটা তিনদিক দিয়ে ঘেরা পাহাড়। মাঝখানে একটি বিশাল খোলা পাকা মাঠ। ওটা হচ্ছে প্যারেড গ্রাউন্ড। ওটার আয়তন একটা ফুটবল মাঠের মত হবে। প্রতিটি পাহাড়ের উপর একটি ব্যারাক, লম্বা টিনের ছাদ এবং এর উল্টা দিকে রান্নাঘর। আর এক পাশে শৌচাগার। এই তিনটা পাহাড়ের নিচের দিকে এক পাশে কিছু পাকা একতালা ঘর যেখানে অফিসাররা থাকেন ও তার একটু দূরে সিপাইরা থাকতো। খুবই সুন্দর জায়গাটা। দু তিনটা প্রাকৃতিক ঝড়না ছিল, পাহাড় থেকে পানি পরছে, পরিষ্কার টলটলে পানি, দেখতে যেমন নয়নভিরাম তেমনি খেতেও খুব স্বাদ। পানিটা ঠান্ডা এবং ঝকঝকে। ওখানে আমরা গোসল করতাম এবং কাপড় ধুতাম। এই ঝরনার কাছে কিছু পাকা ঘর ছিল, ওগুলা ছিল আর্মস-এমুনেশন ডিপো। এই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাইরে সব গ্রামাঞ্চল। ট্রেনিংএর অংশ হিসাবে মাঝে মাঝেমধ্যে ওই গ্রামগুলাতে যেতে হয়েছে। ওখানে মসজিদ দেখেছি আবার আযানও শুনেছি। মনে হত যেন বাংলাদেশেই আছি। ভালই লাগত।

ওই রাতেই আমাদের ১১০০ জনকে তিনটা উইং, তারপর আবার প্রতিটি উইংকে তিনটা প্ল্যাটুন এবং প্রতিটি প্ল্যাটুনকে এগারটা সেকশনএ ভাগ করা হয়। এই তিনটা উইং এর ইনচারজ করা হয় শাজাহান ভাইকে আর ডেপুটি ইন ইনচারজ হোল রতন। প্রতি উইংএ ৩৬৬ জন। প্রতি প্ল্যাটুনে ১২২ জন এবং প্রতি সেকশনে ১১ জন

করে ছিলাম। প্রতি সেকশনে ১১ জন এবং একজন কমান্ডার নির্বাচন করে দেয়া হোল। আমার গ্রুপের কমান্ডার ছিল তৈমুর। আমাদের উইং এর ট্রেনিং এর দায়ীত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রবিন্দ্র সিং। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন অফিসার। উনি তৈমুরকে স্মাইলিং বয় বলে ডাকতেন। ও সবসময় একটু হাসি হাসি মুখে থাকত, সেটাও ওদের নজরে এসেছে। প্রত্যেক উইং এর প্রধান ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন। আর তিনটা উইং এর সার্বিক দায়ীত্বে ছিলেন মেজর মালিক রানা। আর তাদের সাহায্য করত জেসিও, হাবিলদার, সুবেদার এবং সিপাইরা। আর আমাদের প্রতিটা সেকশনের জন্য একজন সিপাই ছিল গাইড করার জন্য যাকে আমরা উস্তাদ বলতাম। আমাদের উস্তাদ ছিল গুরখা রেজিমেন্টের। এই উস্তাদরাই কিন্তু আমাদের ট্রেনিং দিয়েছে, বন্দুক চালান শিখিয়েছে, গ্রেনেড নিক্ষেপ শিখিয়েছে। এরাই আসল। অফিসাররা নজরদারি করত আর প্রয়োজনে উপদেশ, আদেশ ও নির্দেশ দিত।

এই ভাগাভাগির পর আমাদের নিয়ে যায় ব্যারাকে। একটি ছোট পাহাড়ের উপর আমাদের ব্যারাক, ১৬৭ টা পাথর কাঁটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো। অন্য দুটা ব্যারাকের অবস্থানও এরকমই উচ্চতায়। ওখানে নিয়ে আমাদের একটি সত্রুঞ্জি ও বিছানার চাদর, একটি খাবার প্লেট ও মগ, কাপড়ের জুতা মোজা, গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট দেয়া হয়। সাথে একটি গাঁয়ের সাবান ও একটি কাপড় ধোয়ার সাবান, এক প্যাকেট সিগারেট ও দিয়েশলাই দিল। আমরাতো মহা খুশি। অনেক কিছু পেলাম। আমার উইংএর নাম ছিল নজরুল উইং। লম্বা ঘর। পাকা মেঝে, উপরে টিনের চাল। ব্যারাকের ভেতরে লম্বা দড়ি টানান আছে জাতে কাপড় নাড়তে অথবা ঝুলিয়ে রাখতে পারি। উল্টাদিকে রান্নাঘর। আরেক দিকে টয়লেট, গোসল করার জায়গা নিচে, ঝড়নায়। আমরা নিচে নেমে ঝরনাতেই গোসল করতাম, কাপড় ধুতাম সবসময়।

আমরা আমাদের পছন্দ মত জায়গায় সতরুঞ্জি বিছিয়ে বিছানা বানালাম। ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিস রাখলাম। এরপর আমাদের ডেকে চা দেয়া হোল। এক মগ গরম চা। পিওর আসামি চা। ভিষন মজা ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক এই চা। মনে হল যেন সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তারপর আমাদেরকে একটু সময় দেয়া হলো কাপড় বদলানো এবং হাতমুখ ধোয়ার জন্য। রাত ১১ টার দিকে আমাদের রাতের খাবারের জন্য বাঁশি বাজিয়ে ডাকা হল। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিলাম। ডাল, ভাত, শবজি। তারপর সদ্য পাওয়া এক প্যাকেট সিগারেট থেকে একটা বের করলাম। আহ কি যে সুখ। মনে হচ্ছিল কতদিন প্যাকেট খুলে সিগারেট খাইনা। সিগারেট শেষ করে বাথরুম সেরে এবার ঘুমাতে গেলাম। সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেলাম।

আর্মস ট্রেনিং

পরদিন খুব সকালে এক হাবিলদার মেজর এসে বাশি বাজিয়ে আমাদের ঘুম থেকে তুলল। গভীর ঘুমে ছিলাম। ভীষন ক্লান্ত, কিন্তু উঠতেই হলো। মুখ ধোয়ার আগেই দেখি চা রেডি। লাইনে দাড়িয়ে চা নিলাম এক মগ। খুব তৃপ্তির সাথে পান করলাম। তারপর একটা সিগারেট খেলাম। আরও মজা লাগল।

সকাল ৭টার মধ্যে আমাদের পিটি ড্রেস পরে মানে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জী ও কাপড়ের জুতা পরে নিচে নামতে হবে। তিনটা ব্যারাক থেকে সবাই নিচে নেমে এল। সবাই ফল ইন করলাম, মানে শৃঙ্খল ভাবে লাইন দিয়ে দাড়ালাম।

প্রত্যেকটা উইং আলাদা ভাবে দাড়াল। আমাদের উইংএর দায়ীত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রবিন্দ্র সিং। প্রথমে জাতীয় সংগীত। তারপর পিটি পার‍্যাড, তারপর নানা ব্যায়াম ইত্যাদি। ১ঘন্টা পর আমাদের আবার উপরে যেতে বলা হোল। উপরে এসে দেখি নাস্তা রেডি। লুচি, হালুয়া আর গরম গরম চা। পেট পুরে খেলাম। এবার আবার সিগারেট। আধাঘন্টা সময় দেয়া হয় আমাদের এ নাস্তা খাবার জন্য। এরপর আবার নিচে।

এখন থেকে আমরা আর্মস ট্রেনিং নিবো এই উত্তেজনা নিয়ে আমরা আবার নিচে লাইন দিয়ে দাড়ালাম। কিন্তু আমাদের হতাশ করে দিল। বলল এখন তোমাদের ডাব্‌অল আপ করানো হবে। মানে দৌড়াতে নিয়ে যাবে। যেতে হবে গেলাম। এক মাইল দৌড়িয়ে একটা জায়গায় এসে থামলাম। পাশে জংগল। বলল জংগলে ঢুকতে। কথা মত ঢুকলাম। বেশ গভীর জংগল। একটু ভেতরে ছোট ছোট গাছ। সেই গাছগুলার চারদিক পরিষ্কার করতে বলল। মানে আগাছাগুলি টেনে ওঠাতে হবে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, আবার সেই জংগলই পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু প্রতিবাদ করা যাবেনা। আদেশ পালন করতেই হবে। শুরু হলো পরিষ্কারের কাজ। প্রায় তিন ঘন্টা এই কাজ করে আবার বাঁশি, দৌড়িয়ে আসলাম। এবার আবার পিটি করান হোল। ঠিক ১২ টার সময় ছুটি দিল। গোসল করা, দুপুরের খাবার খাওয়া ইত্যাদির জন্য। বলে দিল ৩টার সময় আবার নিচে নামতে।

উপরে গেলাম। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম যে অনেকের পায়ে হাতে জোক লেগে আছে এবং রক্ত খেয়ে ফুলে আছে। জোকের আক্রমন আমার জীবনে এই প্রথম। লবন দিয়ে জোক ছুটানো হোল। কাপড় আর সাবান নিয়ে নিচে নামলাম ঝরনার পানিতে গোসল করতে। একদম পরিষ্কার টলটলে পানি। কিছু পানি খেয়েও দেখলাম, অনেক স্বাদ। গোসল শেষ করে ওপরে উঠে দেখি খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। আমরাও নিলাম। খেয়ে ৪০ মিনিটের মত বিশ্রাম নিয়ে আবার আগের ড্রেস পরে নিচে গেলাম। আবারো সেই ডাবল আপ। সে জংগল সাফ করা এবং ৬ টার সময় ফেরত আসলাম। আবার পিটি। সর্বশেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা এবং ঠিক ৭ টার সময় ছুটি। এখন আর কারও কোন শক্তি নাই। হাত মুখ ধুয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলাম। সবাই ভীষন ক্লান্ত। একটু পর রাতের খাবার খেতে ডাকল। কোন মতে খেয়ে শুয়ে পরলাম আর মূহুর্তের মধ্যেই ঘুম এসে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পর বাশির শব্দে ঘুম ভাঙল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে। আবার আগেরদিনের মত ডিউটি শুরু হোল। এভাবে তিন চারদিন গেল। তারপর একদিন বলল যে কাল তোমাদের ফায়ারিং করাতে নিয়ে যাবো। ওহ সেই কি অনুভুতি, আনন্দ আর উত্তেজনা। এতদিনে আমাদের মনের ইচ্ছা পূরন হতে যাচ্ছে। শরীরের শক্তি অনেক বেড়ে গেল। পরদিন সকালে নিচে গিয়ে রুটিন এক্সেসাইজ করার পর বলল যে নাস্তার পর আমাদের নিয়ে যাবে শুটিং করাতে। নাস্তা খেয়ে আগে আগেই নেমে গেলাম মাঠে। দেখি বাক্স ভরতি গুলি, লাইন দিয়ে স্টেনগান, এস এল আর আর বাক্স ভর্তি গ্রেনেড রাখা। সেগুলি আমাদের দিয়েই নেয়া হোল প্রায় আধা মাইল দুরে এক ছোট পাহাড়ে। ওটার উল্টাদিকেও আরেকটা পাহাড়। প্রথম দফায় আমাদের ২৫ জন করে তিনটা গ্রুপকে আর্মস ট্রেনিং দিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে আগে থেকেই বাংকার করা ছিল। প্রথমে আমাদের আর্মস এমুনেশন সম্পরকে ধারনা দেয়া হয়। তারপর কিভাবে গুলি করতে হয়, গ্রেনেড ছুড়তে হয় এগুলার একটা ডেমন্সট্রেশন দেয়া হয়। এরপর আমাদের দিয়ে পালা ক্রমে প্রথমে ৩০৩ রাইফেল, তারপর এসএলআর এবং স্টেনগান এবং সব শেষে গ্রেনেড নিক্ষেপ করান হয়। দারুন এক অভিজ্ঞতা এবং উত্তেজনা। আমরা সবাই খুবই আনন্দ পাচ্ছিলাম। প্রায় দুপুর

তিনটার দিকে শেষ হয় আমাদের এই পর্ব। সব শেষ হবার পর আমাদেরকে বলল যে এখন অপরদিকের পাহাড়ের গা থেকে পাচটি করে গুলি খুজে নিয়ে আসতে। আমরাতো অবাক। কোথায় পাবো। ওগুলাতো মাটির নিচে ঢুকে গেছে। কিন্তু আদেশ হয়েছে, মানতেই হবে। কোন প্রশ্ন করা যাবেনা। গেলাম ওই পাড়ে। প্রায় ১৫০ ফুট হবে দূরত্ব। গিয়ে খোজা শুরু করলাম। ওমা দুটা পেয়েও গেলাম। কিন্তু আর পেলামনা। আসলাম এই পাড়ে। ক্যাপ্টেনকে দিলাম। উনি কিছু বললেননা। বিকেল চারটার দিকে আদেশ দিলেন প্যাক আপ। আমরা ব্যারাকে ফিরতে ফিরতে ৫টা বেজে গেল। অত্যন্ত ক্ষিধা লেগেছল। ওড়াও টের পেয়েছিলো। তাই আমাদের বলল আজকে ডিনার ৬টার সময়। আমরা তাড়াতাড়ি করে গোসল সেরে উপরে গেয়ে রাতের খাবার খেলাম। আবার নিচে এসে জাতীয় সংগীত গেলাম। আজকের দিনটি খুব উত্তেজনা পুর্ন ছিল। এই প্রথম আর্মস দেখলাম এবং ব্যাবহার করলাম।

এইভাবে গ্রুপ গ্রুপ করে আমাদের ট্রেনিং দেয়া হোত। আর যাদের ফায়ারিং থাকতোনা তাদের আর্মস পরিষ্কার করা, খোলা এবং তার রক্ষনাবেক্ষন শেখানো হতো। দু সপ্তাহের মধ্যে সবার ফায়ারিং আর গ্রেনেড ছোড়া শেখা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অফিসাররা এসে আমাদের মনরঞ্জনের জন্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করতেন। তাছাড়া ফায়ারিং ছাড়া যারা থাকত তাদের গেরিলা যুদ্ধ সম্মন্ধে লেকচার দেয়া, রেইড, এমবুশ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। কিভাবে শহরে, গ্রামে একটা সুশৃংখল বাহিনির সাথে যুদ্ধ করতে হবে সেগুলা শেখাতেন। খুবই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতাম, বুঝতে চেষ্টা করতাম আর মনে মনে ভাবতাম এইভাবেই পাকিস্তান বাহীনিকে পরাজিত এবং দেশ ছাড়া করবো।
৩য় সপ্তাহে আমাদের এমবুশ এবং রেইড ট্রেনিং হয়। অতর্কিতে আক্রমন করা এবং হঠাট কেউ আক্রমন করলে তা প্রতিহত করা বা নিরাপদে পালানো, মানে হিট এন্ড রান, এইগুলা শেখান হয়।
একদিন রাতে হঠাত শুনি গোলাগোলির আওয়াজ। এরমধ্যে হৈচৈ। পাকিস্তান আর্মি আমাদের ক্যান্টনমেন্ট এটাক করেছে। আমাদের জায়গাটা সিলেট থেকে খুব কাছে এবং টাংগুয়ার হাওরের থেকে অতি নিকটে। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের অতিদ্রুত ব্যারাক থেকে নেমে যেতে বলল। যে যেই কাপড়ে আছি সেই কাপড়েই নেমে যেতে বলল। আমরাতো দৌড়িয়ে নেমে গেলাম। ওখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল ক্যাম্পের বাইরে বেসামরিক এলাকায়। চারদিকে ধানক্ষেত আর হাটু পানি। ওখানে নিয়ে বলল হাটু গেরে বসে অথবা শুয়ে কোন আওয়াজ না করে শুধু অবজারভ করতে। হাতে স্টেনগান দিল। আমরাতো ভয়ে অস্থির। কিন্তু ইনডিয়ান আর্মি আছে সাথে তাই কিছুটা সাহস পাচ্ছিলাম। যাই হউক ২ ঘন্টা এইভাবে কাটালাম। মাঝে মাঝেই গুলির আওয়াজ হচ্ছে। আমরা এই পানি কাদার মাঝে ক্রল করে এগুচ্ছি। একসময় শুনি শেষ। পরে জানলাম যে এটা ছিল ড্রিল।ট্রেনিং এর অংশ। কোন পাকিস্তানি আর্মি না, এরাই এটা ঘটিয়ে আমাদের শেখাল। পরে আমাদের কি আনন্দ। মনে হচ্ছিল আসল যুদ্ধেই লিপ্ত ছিলাম। তিন সপ্তাহ পর আমাদের থেকে ১০৩০ জনকে পাঠিয়ে গেল। আর আমরা ৭০ জন রয়ে গেলাম। এই ৭০ জনকে লিডারসিপ ট্রেনিং দেয়া হবে আরও এক সপ্তাহ।

লিডারশিপ ট্রেনিং
১০৩০ জন চলে যাবার পর যেন খালি হয়ে গেল। আমাদের সবাইকে একটি ব্যারাকে রাখা হোল। পরদিন থেকে

শুরু হোল লিডারসিপ ট্রেণিং। এটার দায়ীত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন দীপক চাঁডা, উনি রাজপুত রেজীমেন্টের একজন অফিসার। এটি মূলত থিওরেটিকাল। বিভিন্ন প্রকার স্ট্রেটেজি, কিভাবে কমান্ড করতে হয়, কিভাবে এবং কখন হামলা করতে হয় অথবা সরে আসতে হয় তাই এখানে শিখান হয়েছে। এবং কিছু গাইডলাইন ছিল এই ট্রেনিংএর মূল বিষয়। এখন খাওয়াদাওয়া আরো উন্নত মানের। ভালই ছিলাম। একসপ্তাহ পর আমাদের যেতে হবে। লায়লাপুরে খুব ভাল সময় কেটেছে। অনেক কিছু শিখেছি। একদিন সময় হলো আমাদেরও বিদায় নেবার।

২৮ সেপটেম্বর

চার সপ্তাহ কঠিন ট্রেনিংএর পর এবার আমরা বিদায় নিচ্ছি ভারতীয় সেনাদের কাছ থেকে যারা আমাদের এত যত্ন করে শিখিয়েছেন। সবারই মন খারাপ লাগছিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়িয়েছি সেটা হচ্ছে দেশে গিয়ে যুদ্ধ করা এবং দেশ স্বাধীন করা। যেতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, দেশ স্বাধীন করতে হবে। তাই একটা আনন্দও উপলব্ধি করছিলাম।

বিদায় বেলায় সব অফিসাররা আবার একসাথে এসে আমাদের অনেক উৎসাহ দিলেন, আমাদের যে স্পিরিট তার অনেক প্রশংসা করলেন। সবার শুভ কামনা করে ওনারা বিদায় নিলেন। আর আমরা দুটা ট্রাকে ৭০ জন এবং একটা জিপে একজন অফিসার রওয়ানা হলাম। তখন সকাল ৯টার মত বাজে। আগের রাতে অনেক খাবার বানিয়ে নিয়েছিলাম সাথে নেবার জন্য। সেগুলা খাচ্ছি আর যাচ্ছি। এইভাবে চলতে চলতে একসময় এসে থামলাম একটি ক্যান্টনেমেন্টে। ওখানে আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানানো হলো এবং খুব ভাল খাবার খাওয়ান হোল। দেখলাম গেইটে একটি কুকুর একটা তাবুতে, আর একজন সিপাই তাকে পাহারা দিচ্ছে। পরে শুনলাম ওই কুকুরটা নাকি একজন অফিসার। যাই হউক আবার যাত্রা শুরু এবং ২৯ শে সেপটেম্বর আসলাম সেই পুরান গকুল নগর ক্যাম্পে। নামলাম সবাই। খুব মজার অনুভুতি। এখান থেকেই গেছিলাম। এখন যারা আছে তারা আমাদের দেখতে আসল। হঠাত দেখি সাদেক কাকা। আমার সম্পর্ক ভাতিজা, কিন্তু বয়সে আমার বড়। ওনার ছোটভাই ফরহাদ আবার আমার বন্ধু। উনি বললেন ফরহাদ, আমানও এসেছে। ওরা পালাটোনা ক্যাম্পে আছে। গকুলনগরে কিছুক্ষন থেকে আবার উঠলাম ট্রাকে। ঘন্টা খানেক পর আমরা আসলাম মেলাঘরে, তখন সন্ধ্যা হয় হয় করছে।

.....

সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

৫ম পর্ব

১৯৭১

মেলাঘর ক্যাম্প

মেলাঘর হচ্ছে সেক্টর ২ এর হে'ড কোয়ারটার। সেক্টর ২ এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) খালেদ মোশাররফ আর ডেপুটি কমান্ডার বা সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) এটিএম হায়দার। বলা বাহুল্য যে তখন যুদ্ধের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। আমরা ছিলাম সেক্টর ২ এর অধীন। আর ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালির কিছু অংশ। এই সেক্টর ২ ছিল সর্ব বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন, কারন এর অধীনে রাজধানী ঢাকা। প্রতিটি সেক্টরে একজন কমান্ডার, আর একজন ডেপুটি কমান্ডার নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন।

লায়লাপুর থেকে মেলাঘর পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রায় ২২ ঘন্টা লাগল, মধ্যে গকুলনগর একটু থেমেছিলাম। ওখানেই সাদেক কাকা, সম্পর্কে আমার ভাতিজা এবং ফরহাদের বড় ভাই, ওনার কাছে শুনলাম যে আমান ও ফরহাদ এসেছে আগরতলা, পালাটনাতে ট্রেনিংএ গেছে, এতদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। মেলাঘরে ওদের দেখা পেলেও পেতে পারি। আমান হচ্ছে আমার ভাতিজা, আপন চাচাত ভাইয়ের বড় ছেলে এবং সহপাঠি। রাজারবাগে আমরা পাশাপাশি বাসায় একদম শিশুকাল থেকে। তাই ওদের কথা ভেবেই অনেক আনন্দ লাগছিল। মনে মনে ভাবছিলাম যদি আমান- ফরহাদের সাথে দেখা হয় তাহলে কি মজাই না হবে।

গকুল নগর থেকে ট্রাক রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যার দিকে এসে মেলাঘর ক্যাম্পের গেইটে থামল।
ট্রাক থেকে নেমে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, অনুমতি আসার পর গেইট খুলবে। ভেতরে টিম টিম লাইট জ্বলছে। অনেক লোক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছেনা। মনে মনে খুঁজছি আমানদের। একসময় অনুমতি আসল, গেইট খুলে দিল। আমরা একে একে ঢুকছি আর পরিচিত লোক খুঁজছি। এমন সময় আমার সাথী শরিফ চিৎকার দিয়ে উঠল, বলল তারেক ওই যে আমান। আমিতো মহাখুশি। আমানের সাথে ফরহাদও ছিল। দেখা হল আমান ও ফরহাদের সাথে। প্রায় দু মাস পর এই দেখা। কিন্তু মনে হলো কতকাল পর দেখছি। এই ফরহাদই কিন্তু আমাদের আগরতলা যাবার রাস্তা ঠিক করে দিয়েছিল, তখন পারিবারিক কারনে আমাদের সাথে আসতে পারে নাই।
আমাদের আসার মাস খানেক পর ও আর আমান একসাথে এসেছে। এই দীঁঘ ও ক্লান্তিকর ট্রাক ভ্রমনের কষ্ট যেন এক নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। এই জংগলে এত ঘনিষ্ট কাউকে পাওয়া সত্যিই খুবই আনন্দ ও উত্তেজনাকর। তাই আনন্দের মাত্রাটা ছিল অনেক বেশী। আমার মনে হচ্ছিল খুশীতে চিল্লাই!!! এতদিন পর মনে হল যেন আমি ঢাকার রাজারবাগে আছি। অনেকদিন পর বাসার কাউকে পেলাম। ওরা আমাদের একমাস পর রওয়ানা দিয়েছে। সুতরাং ওদের কাছে অনেক খবর আছে ঢাকার। আমানের কাছ থেকে বাসার খবর নিলাম, বিশেষ করে আম্মার খবর নিলাম, আম্মার শরীর কেমন, আমাকে নিয়ে কি খুব দুশ্চিন্তা করেন কি না, খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করেন

কি না ইত্যাদি। ঢাকার অন্যান্য খবরও নিলাম। খুবই আনন্দ লাগছিল। মনে হচ্ছিল না যে যুদ্ধে এসেছি। যেন বেড়াতে এসেছি পরিবারের সাথে, এরকম লাগছিল। অনেক গল্প হলো। ওরা কি ভাবে আসল, আর আমাদের অন্য বন্ধুরা কে কোথায়, বাবু, সেলিম, বেলাল, এবাদ, পারভেজ, হারুন এদের সবার খোঁজ খবর নিলাম। ঘরবাড়ির খোজ খবর নিলাম। ঢাকায় কেমন অপারেশন হচ্ছে, শহরের অবস্থা কেমন। আর্মির গতিবিধি কেমন। আর আমাদের পরিচিত কেউ ধরা পরেছে কিনা ইত্যাদি।
আমানরা দুদিন আগেই এসেছে, তারা একটি তাবুতে থাকে। আমরা আজকে আসলাম। আমাদের কিছুই ঠিক হয়নি। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আজকে আমরা তাবু পাচ্ছিনা আর রাতের খাবারও না। আমান ফরহাদ আমাদের চিড়া দিল, ওটা খেলাম। যেহেতু তাবু নাই সুতরাং খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটাতে হবে। ভাগ্যিস সতরঞ্জি ছিল। একটা গাছের নীচে মাটিতে সতরঞ্জিটা মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পরলাম। একটু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, ভিজলাম। আবার মাটিটাও সমান নয়, গাছের শিকড় দিয়ে জায়গাটা উচুনিচু। তাও শুয়ে থাকলাম এবং ঘুমও এসে গেল। পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল বাঁশীর তীব্র আওয়াজে। দেখলাম এক বুড়া লোক বাঁশী দিয়ে সবার ঘুম ভাংগাচ্ছে। সবাইকে বলছে ফল ইন করতে, মানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে, তারপর বলছে অপ-আইট, মানে লেফট-রাইট। ভীষন রাগ উঠল। আমাদের এসব করা শেষ। এখন আবার আমরা কেন এসব করব। তারপরও ক্যাম্পের নিয়ম শৃংখলা রক্ষার্থে দাঁড়াতে হয়েছিল। জাতীয় সংগীত গেয়েছিলাম কিন্তু ঐ বুড়ার নির্দেশে লেফট রাইট করি নাই। এ পর্ব দু মাস আগে আমরা শেষ করে এসেছি। বিকেলের দিকে তাবু পেলাম। বেশ বড় তাবু পেলাম, যেখানে মুখমুখি ৬ জন করে ১২ জন থাকা যায়। আমানরা ৪ জন এবং আমরা ১০ জন এ ১৪ জন এক তাবুতেই থাকা শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর হারুন, আমার চাচাতো ভাই, ছোট চাচার ছেলে এবং রাজারবাগেই বাসা, ও আসলো গাজি ভাই (গাজী গোলাম দস্তগীর), বর্তমান আঃলীগ এমপি, ওনার সাথে। আরো ভালো লাগল। মানে রাজারবাগ থেকে আমরা ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা এখন মেলাঘরে। আমি, আমান, হারুন, শরিফ, নশু, ও ইকো ভাই, এই ইকো ভাই হচ্ছেন রাজারবাগে আমাদের পারার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বড় ভাইয়ের মত। ১৯৭১এ ওনাদের বাসায় ভাঁড়া থাকতেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ, অস্ত্র রাখার অভিযোগে পাক আর্মি ওনাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং নৃশংস ভাবে হত্যা করে, এমনকি ডেড বডিটাও দেয় নি। তাছাড়া ফরহাদ আমার ভাতিজা এবং সহপাঠী এবং বাবুল ও মঞ্জুর আমার সহপাঠি এবং আশ্চার্য জনক ভাবে আমাদের সবার দেশের বাড়ি একই জায়গায়, মানে আড়াইহাজার। ফরহাদ আর বাবুল তখন রাজারবাগের কাছেই শহিদবাগ ও শাহজাহানপুরে থাকত। বাবুল ও মঞ্জুর ময়মিনসিংহ এগ্রি ভারসিটির ছাত্র। বাবুল ও মঞ্জুরের দেশের বাড়ি আবার আমাদের দেশেই। এরা সবাই পুর্ব পরিচিত। আর দুজন ছিল, তাদের একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার এবং নাট্যকার আল মনসুরের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ(হেলাল) ভাই, আর অন্য জন হুমায়ুন কবির ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র, ওনারাও শাহজাহানপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাদের সাথে আগে পরিচয় ছিলনা। মানে সবাই খুব কাছের এবং ঘনিষ্ট এটা একটা মজার ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য। তাছাড়া ৪ জন আবার আমার আত্নীয়। মনে হোত এলাকাতেই আছি, পরিবারে সাথেই আছি। সবাইকে ছেড়ে এসেছি এটা আর মনে হচ্ছিল না। বেশ ভাল লাগতে শুরু করল।

মেলাঘরটা ছিল একটা ট্রেনিং, ডিপারচার ও ট্র্যাঞ্জিট ক্যাম্পের মত। সবাই ট্রেনিং নিয়ে প্রথমে এখানে আসে। আবার অনেকে এখানে এসেও কিছু প্রশিক্ষন নেয়। তারপর এখান থেকে আর্মস নিয়ে গ্রুপ গ্রুপ হয়ে দেশের ভিতরে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধ করে। আর যারা যুদ্ধ করতে করতে গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে ওরাও আবার এখানে এসে অস্ত্র, গোলা বারুদ সংগ্রহ করে দেশের ভেতরে ঢুকে।

এ মেলাঘর ক্যম্পের মুল দায়ীত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন এ.টি.এম হায়দার। উনি পাকিস্তান আর্মির একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো। ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার এক অদ্ভুত ব্যাক্তিত্ব। একটি বড় বাংকারে উনি থাকতেন, ওখান থেকেই অফিস পরিচালনা করতেন। সারাদিন কাজ করতেন আর মাঝে মাঝে যুদ্ধে এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে যেতেন। এছাড়া ২৪ ঘন্টা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতেন। আমাদের থাকা, খাওয়া, আমাদের চিকিৎসা, শৃংখলা, মনোরঞ্জন, আমাদের যুদ্ধে যাওয়া, আমাদের অস্ত্র পাওয়া ইত্যাদি সবই ছিল তার দায়ীত্ব। আর একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন। উনি সেক্টর ২ এর রেগুলার আর্মির দায়ীত্বে ছিলেন। এছাড়াও বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার সার্বক্ষিনিক ভাবে আমাদের দেখাশোনা করতেন। সবার নাম মনে করতে পারছিনা।

আমি প্রায় ১৫-১৬ দিন ছিলাম এই মেলাঘরে। দিন রাত ঘুরেছি এই ক্যাম্পের মধ্যে। কখনই ক্যাপ্টেন হায়দারকে ঘুমাতে অথবা বসে গল্প করতে দেখি নাই। সারাক্ষন কাজ আর কাজ। কখনো কোন কাজে গেলে উনি শত ব্যাস্ততার মাঝেও আমাদের কষ্ট, অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সমাধান দিতেন। কখনই বিরক্ত হতেন না। অনেকটা বন্ধুর মত ছিলেন সবার জন্যে। ওনার অফিসটা ছিল একটা রুমের আকারের বাংকারের মধ্যে, উপরে তাবু দিয়ে ঢাকা। ওখানে একটা ছোট খাট থাকত আর টেবিল চেয়ার ছিল। ওই টেবিলেই বসে সারাদিন কাজ করতেন। আমি যতবারই গিয়েছি, দেখেছি উনি একটা তোয়ালে পরে খালি গায়ে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। মেলঘরটা ছিল আবার সর্বশেষ খবরের একটি নির্ভরজোগ্য স্থান। অনেক খবর এখানে পেতাম এবং সাথে সাথে।

এই ক্যাম্পের অনেক ঘটনা। খাবার নিয়ে একদিন ঝগড়া। আসলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, খন্দকার মুশতাক, জেনারেল এম এ জি ওসমানি এবং লেফটেনেন্ট শেখ কামাল। আমরা আমাদের সকল অভিযোগ শোনালাম। বললাম ডালের ভিতর ব্যাঙ পাবার ঘটনা। রুটির মধ্যে বালি আর ভাতের মধ্যে পাথর কনা ইত্যাদি। সাথে সাথে আদেশ দিলেন সপ্তাহে দুদিন মাংস আর ডাল, অন্যান্য দিন শবজি, ডাল ভাত।

আমরা যে ৭০জন এসেছিলাম তাদের মাঝে বেশি বন্ধুত্ব ছিল আমাদের ১০-১২ জনের সাথে। এরা সবাই ছাত্র। কেউ কলেজের, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের, কেউ মেডিক্যাল আবার কেউ ইঞ্জিনীয়ারিংএর ছাত্র। এই ১০-১২ জন এবং আমানদের মধ্য থেকে ৪ জন মিলে আমরা মোট ১৫-১৬ জন এক টেন্টে থাকার ব্যাবস্থা করি। ফলে সবার নজর পরে আমাদের প্রতি। এরমধ্যে একদিন মানু ভাই, যাকে আমি স্কুল জীবন থেকে চিনি, কাকড়াইলে বাসা, ওনার সাথে দেখা হয়। মানু ভাই কয়েক বছর আগে লঞ্চ ডুবিতে পরিবারের আরো ৮ জনের সাথে মৃত্যু বরন করেন। এই মানু ভাইয়ের আরেকটা গুনের কথা বলি। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন উনি আমাদের অংক আর

ফিজিক্স পড়াতেন। বুয়েটের ছাত্র ছিলেন এবং খুব ভাল পড়াতে পারতেন। শুধু তাইনা, পড়ার সময় উনি ক্যাপস্টেন সিগারেটও খাওয়াতেন আমাদের। ওনার একটা অভ্যাস ছিল, উনি সিগারেটে ৩-৪ বারের বেশি টান দিতেননা। ফলে আমরাই ওটা শেষ করতাম। সেজন্যে যদিও আমার অংক ছিলনা, ফ্রি সিগারেট পাবো সে জন্যেই পড়তে যেতাম। তাই যখন মেলাঘরে ওনাকে পেলাম মনে হলো খুব কাছের কাউকে পেয়েছি। উনি জানতে চাইলেন আমরা কোন গ্রুপের সাথে ঢাকা যাচ্ছি। আমরা তখন অন্য একটি গ্রুপে নাম লিখিয়েছিলাম। মানু ভাই বললেন যে তোমরা আমাদের গ্রুপে চলে আস। তখন উনিই আমাদেরকে নিয়ে মায়া ভাইয়ের সাথে পরিচয় করান এবং ওই গ্রুপে যোগ দিতে বলেন। মায়া ভাই তখন একজন দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা, এবং ঢাকায় অনেকগুলা সফল অপারেশনের নায়ক। সবাই খুব সম্মান করে ওনাকে। খুব মজার লোকটি। মাথায় একটি গামছা বেধে ঘোরাঘুরি করেন। কথা বলে আমাদের খুব ভালো লাগল। আমরা তখন মায়া ভাইয়ের গ্রুপে নাম লিখালাম এবং এই গ্রুপটার নাম ছিল ক্র্যাক প্লাটুন। সবাই মাথায় গামছা দিয়ে পট্টি বেধে ঘুরত। মেলাঘরের সবার এই ক্র্যাক সম্মন্ধে খুব ভাল ধারণা ছিল।

মেলাঘরে আমাদের অনেক ধরনের কাজ করতে হোত। মেলাঘরের খাবার মান ছিল থারড ক্লাস অথবা তারও নিচে। সকালের নাস্তা কোনদিনও খাইনি। শুধু চিনিটা নিতাম। পরে পানি দিয়ে সরবত বানিয়ে খেতাম। সেটাই দারুন উপভোগ করতাম। আর যেদিন চিনি পেতামনা সেদিন প্রায় আধা মাইল দূরে একটি গ্রাম ছিল, ওখানে এক বাড়িতে একটি আমলকি গাছ ছিল। আমরা ওখানে গিয়ে আমলকি পারতাম, সেটা কিছুক্ষন খেয়ে চাপকল থেকে পানি নিয়ে সেটা পান করতাম, পানিটা তখন মিস্টি লাগত। এটাও খুব মজা লাগত। পকেটে টাকা পয়সা কিছু নেই যে কিছু কিনে খাবো। এমন দুঃসময়ে বাবুল একদিন ১০ টাকা দিলো। কোথায় পেলি জিজ্ঞেস করতে বলল যে সে তার ঘড়িটা বিক্রি করেছে ৭০ টাকায়, আর তা থেকে আমাদের কয়েকজনকে ১০ টাকা করে দিয়েছে। দারুন ফুরতি লাগল। ঐ দশ টাকা এখন হাজার টাকা থেকেও বেশি মুল্যবান ছিল। কিভাবে খরচ করবো, কি কিনব, কি লাগবে আর কত জমা রাখব ইত্যাদি নিয়ে অস্থির হচ্ছিলাম। খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল এই ঘটনা গুলি। তাছাড়া ফরহাদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র ও প্রতিদিন রাতে ঘুমাবার আগে কয়েক বোতল পানি ভরে রাখতো আমাদের সবার জন্য, কারণ পানি আনতে যেতে হয় অনেক দূর। তাই রাতে যদি লাগে এবং সকালে মুখ ধুতে তো লাগবেই। সেই ভালো কাজটি করে সে একটি খেতাব পেল। তার নাম দিলাম বোতল কমান্ডার। এই ছিল তার পুরস্কার। এছাড়া মুকাররাম ভাই, কুষ্টিয়ার লোক। শুধু চিনি খেতেন, ওনার নাম ছিল চিনি মুকাররাম। এইরকম আরো অনেক ইতিহাস আছে। এদিকে আমাদের খাবার মান বেড়েছে। দুদিন খাশি পাচ্ছি। নশু বলল ও মাথা গুলা আলাদা ভাবে রান্না করে আমাদের খাওয়াবে। তাই হলো। নশু গরুর মত খেটে খাশির ৭টা মাথা রান্না করল। মায়া ভাই সহ আমরা প্রায় ২৫ জন খেলাম, দারুণ হয়েছিল। এই রান্নার প্রশংসা ক্যাপ্টেন হায়দার পর্জন্ত পৌঁছেছিল। তাতে আমাদের লাভ হয়েছিল যে আমাদের সবাই দ্রুত চিনে ফেলে এবং আমরা গুরুত্বপুর্ন হয়ে উঠি, যদিও আমরা একদম নতুন।

কিন্তু দেশে কবে ফিরবো এটাই অনিশ্চিত। আর্মস আসবে তারপর আমরা ঢুকব এইটুকু জানি। কবে আর্মস আসবে কেউ জানেনা। আপাতত খাইদাই ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই ক্যাপ্টেন হায়দারের টেন্টে যাই। সবসময়ই ওনাকে দেখি একটি টাওয়েল পরে তার টেবিলে বসে মনোজোগ দিয়ে কাজ করছেন, আর তার পাশে একজন কাল মত

সুঠামদেহি, জেনারেল ওসমানির মত মোছ, ছোট ছোট চুল বসে উনিও কাজ করছেন। প্রথমে ভাবতাম বোধহয় আর্মির কেউ, পরে জানলাম উনি বেসামরিক, নাম সাত্তার, বাড়ি মানিকগঞ্জ। ধীরে ধীরে ওনার সাথে সক্ষতা গড়ে ওঠে। এই সাত্তার ভাই যুদ্ধের পরে আমাদের খুব আন্তরিক বন্ধু, বড় ভাইয়ের মত ছিলেন। একবার উনি হাসপাতালে ভরতি হয়ে আমাকে আর আমানকে ডাকলেন। বললেন তোদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। খুব আন্তরিকতার সাথে পরিবারের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার কিছুদিন পর রোজার সময় তারাবি পড়তে গিয়ে মসজিদের ভেতরেই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ ওনাকে বেহেস্ত নসিব করুন।
মায়া ভাইয়ের গ্রুপে আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয়। ফতেহ আলি চৌধুরী , গাজি গোলাম দস্তগির পরে (এমপি)। মশগুল ভাই, এখনো উনি আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং একজন বর ভাইয়ের মত। কিছুদিন আগে পেট্রবাংলার ডায়রেক্টর হিসেবে অবসর নিয়ে এখন কনসাল্টেন্সি করছেন, শেলি যার ভাল নাম সৈয়দ হাশেমি, ও এখন ব্র্যাক ইউনিভারসিটির অর্থনীতির অধ্যাপক, তখন ও ঢাকা কলেজের ছাত্র। আবু তাহের নোয়াখালির ছেলে শুধু কানত। তাছাড়া আনু, দুলাল, বিদ্দুত, করিম, মানিক, রেজু ভাই, সিরাজ ভাই, পুলু ভাই এবং আরো অনেকে যাদের নাম ভুলে গেছি। আরেকজনার কথা না বললেই নয়। উনি আমাদের ইকো ভাই। আমাদের পাড়ার এবং একদম ছোট বেলা থেকেই চিনি। ওনার ছোট ভাই আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিল। তার ছোট ভাই আমার এক বছরের বড়। ওনারাও রাজারবাগের স্থায়ী বাসিন্দা। ওনাদের বাসায়ই আলতাফ মাহমুদ থাকতেন এবং আর্মস রাখার অভিজোগে ধরা পরেন আর পাকিস্তানিরা ওনাকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। ইকো ভাইকে পেয়েও খুব খুশী হয়েছিলাম তবে উনি অনেক বড় বলে ভয়ও পেতাম কথা বলতে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই উনি আমাদের সাথে এক হয়ে গেলেন। বর্তমানে উনি অসুস্থ, পারকিন্সনিজম রোগে ভুগছেন। ওনার জন্য সবসময়ই দোয়া করি এবং বিশেষ বিশেষ দিনে সবাই মিলে দেখা করতে যাই। ইকো ভাবি আমাদের দেখলে এবং ওই বাসায় গেলে না খাইয়ে ছাড়বেনইনা। তবে ইকো ভাই এখনো সদা হাস্যময়। দেখলেই একটা নির্মল হাসি দিয়ে আমাদের অভ্যরথনা জানাবেন।

তবে মেলাঘরের একটি চরিত্র কেউই ভুলতে পারবেনা। যিনি প্রথম দিন আমাদের অপ-আইট করিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন মেলাঘরের সবার পরিচিত নানা। নাম ছিল লাল মিয়া, সুন্দর দেখতে, গায়ের রং লাল। বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মেজর। উনি আমাদের রোজ সকালে তীব্র বাশী বাজিয়ে ঘুম থেকে ওঠাতেন। তারপর লেফট রাইট করাতেন। বলতেন অপ- আইট। মানে লেফট রাইট। টেনশন মানে এটেনশন। আমরা কিন্তু এইসব ট্রেনিং করা শেষ। তবুও করতে হত। তাই আমাদের ছিল বেজাই রাগ তার উপর। কিন্তু সে নাছোরবান্দা। করাতোই প্যারেড। দেখলেই রাগ উঠত, প্যারেড ছাড়া অন্য সময় ওনাকে দেখলেই আমরা তার উচ্চারণ নিয়ে হাসতাম। আহা সেই নানা আজ আর নেই। যত কঠিনই হউন না কেন, উনি ছিলেন আবার আমাদের সবার নানার মতই স্নেহশিল। কিছু আবদার করলে সেটা পুরনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। অবসর সময়ে আমাদের গল্প শোনাতেন, আমাদের সাথে মজার মজার ঠাট্টা করতেন। একজন আন্তরিক ব্যাক্তিত্ব ছিলেন এই নানা।

এ ভাবে যখন দিন কাটাচ্ছি তখন একদিন শুনলাম আর্মস এসেছে। মায়া ভাই আমাদের ডেকে বললেন যে তোমরা গ্রুপ তৈরি কর। আমি, ফরহাদ, হারুন আর আমান গেলাম গাজি ভাইয়ের গ্রুপে। পরে আমাদের আর্মস দেয়া

হোল। প্রত্যেকে একটি স্টেনগান এবং চারটি গ্রেনেড সাথে অনেক বুলেট। আজ আমরা সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা। কিযে আনন্দ লাগছিল বোঝাতে পারবোনা। পরে ক্যাপ্টেন হায়দার আমাদের মাঝে আসলেন। বললেন যেদিন সবুজ সংকেত পাবো সেদিন তোমরা রওয়ানা দিবে। এখন তোমরা এইগুলা সাবধানে তোমাদের হেফাজতে রাখবে। একটু মন খারাপ হোল, কিন্তু তাও খুশি। কারন দেশে যাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার। আমরা মজাতেই ছিলাম। কিন্তু একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনি আমাদের একজনার আর্মস গায়েব। খোজ লাগালাম। কিন্তু কোথাও পেলামনা। মায়া ভাইকে জানালাম। উনিতো ভিষন রেগে গেলেন। বললেন আর্মস রাখতে পারনা, যুদ্ধ করবে কি। মনটা খারাপ হয়ে গেল সবার। সন্ধায় এলেন ক্যাপ্টেন হায়দার। আমাদের অবস্থা শুনলেন। তারপর একটু রাগও করলেন। আমাদের বোঝালেন যে যেহেতু এখন আর্মস আছে, তাই রাতে অন্তত একজন পাহারা দিতে হবে। আমরা মাথা নত করে শুনলাম এবং ভুল স্বীকার করে মাফ চাইলাম। পরে উনি আমাদের হারানো আর্মসটা ফেরত দিলেন। বললেন গত রাতে উনি আমাদের ঘুমে দেখে এইটা নিয়ে যান। আমরাতো হাপ ছেড়ে বাচলাম। যাই হোক এরপর আর এরকম হয়নি। আমাদের সাথে ট্রেনিং নেয়া একজন ছিল মঞ্জুর নামে। ওর দেশ আমার দেশেই। গকুলনগরে ওর সাথে পরিচয় হয়। তারপর থেকে বন্ধুত্ব। ও তখন ময়মিনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মেলাঘরে আমরা যখন গ্রুপ বানাই ও তখন বলল যে ও দেশের বাড়িতে যুদ্ধ করতে চায়, আর আমরা চাই ঢাকা শহরে। সুতরাং ওর গ্রুপ ভিন্ন এবং এলাকাও ভিন্ন। একদিন ওর যাবার আদেশ আসল। রাতে খেয়ে রওয়ানা হবে। ও আমাদের অনুরোধ করল যে আজকে এক প্লেটে সবাই খাবো। তাই হোল। আমরা সবাই ওর প্লেট থেকে খাবার খেলাম। একসময় ও বুক মিলিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওর যাবার ৮-১০ দিন পর আমরাও দেশে ঢুকি। আশ্চার্জজনক ভাবে আমাদের প্রথম অস্থায়ী ক্যাম্পটা ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ির উল্টাদিকের গ্রামে নাম জামপুর। আমরা সবাই ভাবলাম একটু মঞ্জুরের খোজ নেই। ওর গ্রাম আমাদের পাশের গ্রাম ইদবারদিতে। খোজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম যে গত কয়েকদিন আগে পাক আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মঞ্জুর শহিদ হয়েছে। ভিষন খারাপ লাগল। মাত্র ৮-১০ দিন আগেই আমরা এক প্লেট থেকে খেয়ে ওকে বিদায় দিয়েছি, আর আজ ও নেই। ভাবতেই পারছিলামনা এমনটি শুনব। তবে এরকমই ছিল মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি।
মেলাঘরের আরও অনেক গল্প আছে।

যেমন মেলাঘরে একদিন সিগারেটের জন্য আমরা মরিয়া। কি করা যায়। পকেটে কোন পয়সা নেই যে কিনব। তখন দেখলাম এক লোক সিগারেট খেতে খেতে যাচ্ছে, ওনার কাছে গিয়ে বললাম ভাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে এসেছি, টাকা পয়সা নাই সিগারেট কিনার। আপনি কি আপনার খাওয়া অর্ধেকটা সিগারেটটা দিবেন। উনি একটু থেমে আমাদেরকে একটা পুরা সিগারেট দিয়ে দিলেন। আমরাও সাথে সাথে নিয়ে নিলাম। রাতে আমাদের টেন্টে গান হোত। সপন কুমার ভৌমিক খুব সুন্দর গান গাইত। ক্ষুদিরামের একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, মাগো হাসি হাসি, পরব ফাসি এই গানটা শোনার জন্য প্রায়ই অন্য তাবু থেকে অনুরোধ আসত। এরকম অসংখ্য ঘটনার আমাদের এই মেলাঘরের।

এ ভাবে প্রায় দিন ১৫ থাকার পর একদিন বিকালে খবর এল আজ রাতে আমরা রওয়ানা হব ঢাকার উদ্দেশে। খুশিতে মন ভরে গেল। সাথে সাথে অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। বিদায় নিলাম অনেকের কাছ

থেকে, সবাইকে বললাম মাফ করে দিতে, কত কথা, কত ঝগড়া হয়েছে মনে নেই, তাই একটি শুভ বিদায় আমাদের সবার কাম্য ছিল। জানিনা আর কখনো দেখা হবে কিনা। সবাই বিদায় দিল, দোয়া করলো যেন নিরাপদ হয় আমাদের যাত্রা। যাবার সময় সাথে থাকছে একটা বাগ আর বন্দুক, গুলি, গ্রেনেড, প্লেট, মগ ইত্যাদি। এতকিছু এক ব্যাগে আটছেনা। তাই ভাবলাম প্যান্ট কেটে আর একটা ব্যাগ বানিয়ে নেই। প্যান্ট নিয়ে গেলাম ক্যাম্পের ভিতরেই দরজির কাছে। তাকে বললাম যে আমার ফুল প্যান্টটা কেটে হাফ প্যান্ট করে দেন, আর দু পায়ের কাটা অংশ দিয়ে একটা ব্যাগ বানিয়ে দেন। সেই দরজি প্যান্টের পা দুট কেটে সুন্দর একটা ব্যাগ বানিয়ে দিল, আবার দুই কাধে ঝুলানর জন্য কাপড় দিয়ে দুটা ফিতার মত বানিয়ে দিল। এর জন্য সে কোন পারিশ্রমিক নিলনা। এতেকরে আমার দু হাতই খালি হয়ে গেল। এই ব্যাগটা থাকবে আমার পিঠে, আর দুই কাধের এক দিকে স্টেনগান আর অন্য দিকে আমার পুরান ব্যাগটা। মোটামোটি ২০ কেজির মত ওজন ছিল আমার সাথে। সন্ধ্যায় খাবার খেলাম। সবাই রেডি, শুধু ডাকের অপেক্ষায়। রাত ৯ টার দিকে এল ট্রাক। আমরা ক্র্যাকের এবং অন্যান্য গ্রুপের প্রায় ১১০ জন ট্রাকে গাদাগাদি করে উঠলাম। একসময় ট্রাক রওয়ানা হয়ে গেল। ছেড়ে আসলাম আমাদের সেই প্রানের মেলাঘর এবং আরো অনেক পরিচিত মুখ।

.....

সেই আগুন ঝরা দিনে

- যুদ্ধে নামার আগে

৬ষ্ঠ এবং চুড়ান্ত পর্ব

১৯৭১

ঢাকা ফেরত

মেলাঘরে আসার পর থেকেই ঢাকা যাবার জন্য অস্থির লাগছিল। ঢাকা যাবো, অপারেশন করবো এটাই ছিল আসল ইচ্ছা, তাছাড়া সবার সাথে দেখা হবে এটাও কম না। কিন্তু কেন জানি যাওয়া হয়ে উঠছিলনা। খালি দেরী হচ্ছিল। তবে একদিন সে স ময়টি চলে এল। আজ আমরা সত্যি সত্যি ঢাকা যাচ্ছি। আহ কি যে খুশী লাগছিল এই খরটি শোনার পর। মহা আনন্দ আর চরম আবেগে সবাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আর কখনো দেখা হবে কি না কেউ জানেনা। বেচে থাকব কিনা কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং আজই শেষ দেখা হচ্ছে এরকমই একটা অনুভুতি। রাতে অনেকে মিলে একসাথে খাবার খেলাম। আনন্দ আর উত্তেজনায় ক্ষিধাও চলে গেছে। এখন হচ্ছে বিদায়ের বেলা। সে এক অসাধারন অনুভুতি। সত্যি মনে হচ্ছিল যে পরিবারের অনেককে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদিও জীবন বাজি রেখেই যুদ্ধে গেছি কিন্তু বিদায়টা আসলেই অনেক কঠিন বাস্তব। একসময় আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলামনা। সবার কাছ থেকে ভুল ত্রুটির জন্য মাফ চেয়ে, সবার আশির্বাদ নিয়ে মেলাঘর ছাড়লাম রাত দশটার দিকে।

রাত ১০ টায় দুটি ট্রাক মেলাঘর থেকে আমাদের নিয়ে রওয়ানা দিয়ে ঘন্টা খানেক পর এক জায়গায় এসে থামল। ইন্ডিয়ার বর্ডার, জায়গাটার নাম হাতিমারা। এরপর আর গাড়ি চলবেনা। চারদিক অন্ধকার, গাড়ির রাস্তা শেষ। এখান থেকে ঢাকা পর্যন্ত আমাদের পায়ে হেটে অথবা নৌকায় করে যেতে হবে। আমাদের পথ দেখানর জন্য লোক ঠিক করা ছিল। ওরা এলাকায় শান্তি কমিটির সদস্য হিসাবে পরিচিত, কিন্তু কাজ করত মুক্তিদের জন্য। এবার আমাদের পায়ে হাটা শুরু। অন্ধকার, কাঁদা পানি, উচু নিচু পিচ্ছিল এবং সর্বোপরি অত্যন্ত বিপদজনক এই রাস্তা দিয়ে। কোথায় মিলিটারি আছে বোঝা খুবই মুশকিল। আর আমরা ময়নামতি সেনানিবাসের খুব নিকট দিয়েই কুমিল্লা হয়ে ঢাকা আসব। খুবই সাবধানে এগুচ্ছিলাম। কোন কথা বলা, আওয়াজ করা, সিগারেট খাওয়া একদম নিষেধ। শুধু সামনের জনকে অনুসরন করতে হবে। পুরা পথেই পাক আর্মির গোলাগোলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। প্রায় ৪ ঘন্টা হেটে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সীমানা ঘেষে, গমুতি নদি সাতরিয়ে পার হই, তারপর আবার হেটে আমরা আসি দীঘিরপার। এই নদি পার হতে পারছিল না আমাদের কয়েকজন সাথী। তখন তৈয়ব আলি বীর প্রতিক তাদেরকে কাঁধে করে একজন একজন করে পার করে। নদি পার হয়ে বেশ কিছু পথ একদম হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হচ্ছিল। বেশ খানিক পর আবারও হাটা শুরু করে আমরা একটি স্কুলভবনে এসে আশ্রয় নিলাম। এই আসার পথে অনেক ভয়, অনেক মজা এবং আবেগঘন ঘটনা ঘটে গেছে। পুরা পথেই পাক আর্মির গোলাগোলির আওয়াজ হচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন একদম আমাদের কাছেই চলে এসেছে। তারপরও আমরা কিন্তু ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়েই এসেছি। আসার পথে গভীর রাতে দেখি গ্রামের রাস্তায় এক প্রৌড় লোক অন্ধকারে বসে তসবিহ হাতে আমাদের জন্য, দেশের জন্য দুহাত তুলে দোয়া করছেন। খুব ভাল লাগলো। মনটা আনন্দে ভরে গেল। রাস্তায় কাঁদা পানি থাকাতে হাটা খুব কষ্টকর হচ্ছিল। আর তার মাঝে আমাদের পারার এক বড় ভাই

ইকো ভাই বলে যাকে ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি, উনি বারে বারে আছাড় খাচ্ছেন, ওইটা আমাদের জন্য এই বিপদের মধ্যেও খুব মজার কারন ছিল। উনি পড়ে গেলেই আমরা বলি আবার পড়েছে আর হাসি। উনি বোঝেন কিন্তু ভাব দেখান যেন কিছুই দেখেন নি বা শোনেন নি।

আমরা প্রায় ৮৪ জনার একটি দল। সাথে হালকা এবং ভারী অস্ত্র। মোটামোটি ভাবে সবার কাঁধে কমপক্ষে ২০ কেজি ওজন নিয়ে আমাদের যাত্রা। এখানে অনেকেই ছিলেন যারা ২-৩ বার আসা যাওয়া করেছেন এবং দেশের ভেতর অনেক সফল অপারেশন করে এসেছেন। যে স্কুলে উঠেছিলাম সেই স্কুলে আমরা রাতের শেষ ভাগ এবং সারাদিন কাটাই। এসে এই রাতেই আমরা স্কুল প্রাঙনে একটি পুকুরে গোসল করি। আমাদের একটা লাইফ বয় সাবান দেয়া হয়। দীর্ঘ তিন মাস পর এমন ভরা পুকুর দেখলাম। খুব মজা করে গোসল করলাম। মনে হল তিন মাসের ময়লা সব আজই পরিষ্কার করলাম। খুব ক্ষিধা লেগেছিল। আসার সময় একটি দোকান থেকে ১৪ আনা দিয়ে ভাত আর মাছ খেয়েছিলাম। তখনকার দিনে ১৬ আনায় ১ টাকা হত। কিন্তু গোসল করার পর ক্ষিধাটা আরও বেড়ে গেল। কি করবো। কোথায় পাবো খাবার। তখন দেখি একটি ছোট মেয়ে, সম্ভবত বাইরে টয়লেট করতে বেড়িয়েছে। ওকে বললাম কিছু খাবার দিতে পারবে। আমাদের খুব ক্ষিধা লেগেছে। ভাবলাম বলে দেখি, আসলেত কিছু পাওয়া যাবেনা। ওমা, একটু পর দেখি ও আমাদের জন্য লবন পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে মাখান এক বিশাল বোল চীড়া নিয়ে এল। কিযে খুশি লাগল। মূহুর্তের মধ্যে তা শেষ হয়ে গেল। বোলটা ঐ মেয়েটাকে ফেরত দিয়ে দিলাম, ও চলে গেল। এরকম সাহায্য সহযোগিতা না পেলে হয়ত দেশটা স্বাধীন করতে আরও অনেক কষ্ট হত। এরপর সারাদিন স্কুলের রুমের ভেতর। সারাটা দিন বলা যায় বন্দী অবস্থায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম। বের হওয়া নিষেধ ছিল। দুপুরের দিকে দেখলাম আমাদের জন্য ভাত ডাল আর শবজি এসেছে। সেটাও খুব মজা করে খেলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এবার আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। সন্ধ্যার একটু পর আমরা খুবই সতর্কতার সাথে বের হয়ে আবার যাত্রা শুরু করি। এবার প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার পথ পারি দেই এক হাটায় আমরা চলে আসি রামচন্দ্রপুর বাতাকান্দি। ওখান থেকে তিনটি নৌকায় আসি বাতাকান্দি। এরপর সারারাত এবং দিনের কিছু সময় পার করে আমরা বাতাকান্দি এসে পৌছাই। এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করি প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করি। এখান থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাদ বাকি রাস্তা আমরা নৌকায় যাব। সুতরাং এখন একটু আরাম করা যাবে। তবে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, রাস্তায় পাক আর্মির মোকাবেলা হলে নৌকা থেকেই যুদ্ধ করতে করতে হবে আর হয়ত মরতেও হবে। সুতরাং শারিরিক ভাবে আরাম হলেও মানসিক চাপে ছিলাম সবাই। পথে লোকাল মুক্তিদের সাথেও দেলহা হতে পারে, ভুল বোঝবোঝির কারনে তাদের সাথেও গোলাগোলি হতে পারে। কারন এলাকায় রাজাকাররাও এখন অনেক শক্তিশালী এবং তারাও মুক্তি পরিচয় দিয়ে হঠাৎ গুলি করে সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। তাই প্রতি এলাকা পার হবার আগেই ওই এলাকার মুক্তিদের জন্য নির্ধারিত পাসওয়ার্ড জেনে নেয়া একেবারে জরুরী। ওখান থেকে নৌকায় ধীরে ধীরে আমরা চলতে চলতে একসময় আমরা এসে পৌছাই কুমিল্লা জেলার বাতাকান্দি গ্রামে। ওখানে আমরা কিছু খাবার খাই নারায়ানগঞ্জ জেলার বৈদ্যারবাজার থানার বুরুমদি গ্রামে। এই বুরুমদি হচ্ছে আমার খালার বাড়ি এবং ফরহাদের মামার বাড়ি। ওখানে এসে আমাদের একটু খাবার বিরতি। বলে রাখা ভাল যে এখানে নৌকা ছাড়া আর কোন ভাবে আসা যায়না, তাই এ পর্জন্ত এখানে পাক আর্মি আক্রমন করতে সাহস পায়নি। যাই হোউক সবাই যখন খাবার জন্য অপেক্ষা করছে তখন ফরহাদ বলল যে ওর মামার বাড়িতে যাবে এবং দেখা করেই চলে আসবে। তখন আমরা চারজন মিলে ফরহাদের সাথে ওর মামার বাড়িতে গেলাম। পাচঁ

মিনিটের হাটার রাস্তা। তখন দুপুর ১টার মত বাজে। গিয়ে দেখি ওর মামারা খেতে বসবে। খাবার টেবিলে লাগান হয়েছে। আমাদের দেখেই ওনারা খাবার টেবিল ছেড়ে দিলেন এবং বললেন আমাদেরকে খেতে। আমরাও লজ্জা না করে বসে গেলাম আর ওদের খাবারটা গোগ্রাশে খেয়ে ফেললাম খুবই তৃপ্তির সাথে। এরপর আবার নৌকায় ফেরত আসলাম। আবার চলল নৌকা। এবার এসে ভিড়ল জামপুর। জামপুর হচ্ছে আমাদের গ্রামের বাড়ি প্রভাকরদির দক্ষিন দিকে নদীর অপর পারে। আমরা এই প্রভাকরদি থেকেই মুক্তিযুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলাম আর ফেরতও আসলাম সেই প্রভাকরদিতে। খুবই খুশি লাগছিল। জামপুরে আমার ছোট চাচার কেনা এক হিন্দু বাড়িতে আমাদের অস্থ্যায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয় যার মূল দায়ীত্বে ছিলেন আমার সেই চাচার বড় ছেলে আনিসুর রহমান (ফিরোয মিয়া)। আমাদেরত আরও খুশি লাগল। সন্ধ্যার কিছু আগে মায়া ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে আমরা, আমি, আমান হারুন এবং ফরহাদ গেলাম নদির অপর পারে আমাদের বাড়িতে। ওখানে আমার অনেক আত্নীয়সজন ছিলেন। ছিলেন আমার ছোট চাচাও। ওনারা আমাদের দেখে ভীষন খুশি হলেন। আমরা জামপুর আসার সাথে সাথেই ওনারা খবর পেয়েছিলেন তখনই ঢাকায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লোক মারফত যে আমরা ফেরত এসেছি। পরদিন আমার মেজভাই আর আমানের আব্বা মানে আমার চাচাত- খালাত ভাই, দুজন দুই বিরাট টিফিন কেরিয়ারে করে পোলাও, মুরগির রোস্ট, গরুর গোস্ত আরও অনেক কিছু নিয়ে হাজির। দির্ঘ তিন মাস পর ভাইকে দেখে কেঁদেই ফেললাম। বহুদিন পর আম্মার হাতের রান্না করা খাবার খাচ্ছি, কিযে মজা বলার নাই। অনেক খেলাম। অনেক গল্প হলো ভাইয়ের সাথে। সবশেষে ভাই বললেন আম্মা দেখতে চান আমাকে, তাই ওনার সাথে যেতে হবে। আমরা বললাম অসম্ভব, মাত্র এসেছি, কোন অপারেশন করি নাই, বেরাতে যাওয়ার অনুমতি মিলবেনা। ভাই এবং চাচার অনুরোধে মায়া ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে বললাম যে একদিনের জন্য ঢাকা যেতে চাই। মায়া ভাই খুশী হলেন না কিনু অনুমতি দিলেন। রাজি হলেন। বললেন এক দিনের বেশি না থাকতে। ভাইয়ের সাথে এলাম ঢাকায়। বাসায় ঢুকতেই সবাই শুধু তাকিয়ে দেখে আর কি যেন ভাবে, ভয় পায় নাকি বিশ্বাস করতে পারেনা নাকি অন্য কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাতিজাগুলা চাচাকে পেয়ে আনন্দে আত্নহারা। মহা আনন্দ। দুপুরে খেয়ে দেয়ে আম্মার সাথে শুয়ে কত গল্প। তিন মাসের গল্প এক নিশ্বাসে বলে ফেলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। আম্মা খালি আমার মাথা হাতাচ্ছেন, না হয় গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আর এই তিন মাস ওনার কেমন লেগেছিল সেটা বলছেন। আমি নাকি অনেক শুকিয়ে গেছি, কাল হয়ে গেছি, চামড়া নাকি খসখসে হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই আমাকে এত বেশি যত্ন নিতে শুরু করল যে আমার অস্থির লাগতে আরম্ভ করল। দুটা দিন মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আবার মন খারাপের পালা। এবার আমি রাগ করে বললাম আর যদি এমন করেন তাহলে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর আসবো না।

বিদায় নিয়ে আবারও অতি সাবধানে ক্যাম্পে ফেরত এলাম। আমাদের মুল লক্ষ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের অতি নিকটে গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করা এবং সেখান থেকে ঘন ঘন ঢাকা শহরে অপারেশন পরিচালনা করা।

.....

মাসুদুর রহমান (তারেক) এফএফ
Masudur Rahman (Tarek) FF.
মোবাইল : ০১৭১১-৪০৩-১২৩.
ই-মেইল:masud.rahman.tarek@gmail.com
লেখক একজন ডাক্তার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।